সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

ঊনসপ্ততিতম বর্ষ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৯ ॥ সংখ্যা ১-৪

সূচীপত্র

মূল্য আট টাকা

পরিষদের সদস্য পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৬৯ সংখ্যা ১-৪
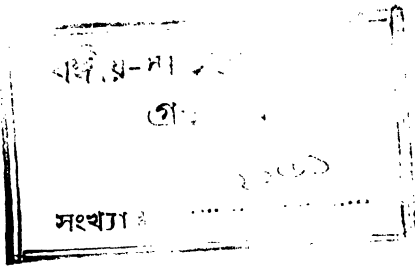
অমৃত-কুণ্ড

আবু মুহম্মদ হবিবুল্লাহ্

ভারত, পাকিস্তান ও ইউরোপের বিভিন্ন পুঁথিশালায় 'বাহ্রুল্হায়াত' নামে ফারসী ভাষায় যোগ ও তন্ত্র-বিষয়ক একটি পুস্তকের একাধিক হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত আছে।[১] প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে মাদ্রাজ থেকে পুস্তকটির একটি লিথো সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।[২] প্রায় প্রত্যেক পুঁথিতেই একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় পুস্তক রচনার যে বিবরণ দেখা যায় তা সংক্ষেপে এই—

"হিন্দ্ভী ভাষায় প্রথমে এই পুস্তকটির নাম ছিল 'অমৃত-কুণ্ড'। মুসলমানদের মধ্যে এর প্রচার এইভাবে হয়: সুলতান আলী মরদান যখন বাঙলাদেশ জয় করেন এবং সেদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচলিত হয়, তখন সে সংবাদ কামরূপে পৌঁছিল। 'কামা' নামে সেখানকার এক প্রথিতযশা পণ্ডিত, যোগশাস্ত্রে যাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, তখন মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হবার উদ্দেশ্যে লখ্নৌতি শহরে আসেন। শুক্রবারে জুম্মা মসজিদে তিনি মুসলমান পণ্ডিতের অনুসন্ধান করলে সকলে তাঁকে কাজী রুকনুদ্দিন সামারকন্দীর কাছে যেতে বলে। তাঁর কাছে গিয়ে যোগী পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন—'তুমি কার উপাসনা কর?' উত্তর পেলেন—'আমরা নিষ্কলঙ্ক আল্লাহ্র উপাসনা করি।' আবার প্রশ্ন করলেন—'তোমাদের গুরু কে?' উত্তর পেলেন—'মুহম্মদ, যিনি আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ।' যোগী আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাদের গুরু আত্মার কি সংজ্ঞা দিয়েছেন?' কাজী বললেন—'আত্মাকে তিনি বিধাতার সৃষ্টি বলেছেন।' যোগী তখন বললেন— 'তাই ঠিক; আমি নিজেও ব্রহ্মোপনিষদে (?)[৩] এই রকম কথাই পেয়েছি।' লোকটি তারপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং ইসলামি শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হলেন। অল্পকালেই তিনি শাস্ত্রে এমন সুপণ্ডিত হলেন যে মুসলিমশাস্ত্রীয় প্রশ্নে তাঁর কাছে বিচার চাওয়া হত এবং তিনি ফতোয়া দেবার অধিকারী হলেন।

"সেই সময়ে তিনি এই পুস্তকটি উপঢৌকন স্বরূপ উক্ত কাজীর হাতে অর্পণ করেন। কাজী সে পুস্তকটির একটি আরবী অনুবাদ করেন ৩০ অধ্যায়ে। আর একজন লোক দশ অধ্যায়ে তার একটি ফারসী অনুবাদ করেছিল। শেষোক্ত এই অনুবাদটিতে কিন্তু অনেকগুলি হিন্দ্ভী শব্দ অসংলগ্নভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে লোকে শব্দগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারত না। হজরত গওস্ নিজে কামরূপে গিয়ে কয়েক বৎসর ধরে এই শাস্ত্রের যথাবিহিত চর্চা করেছিলেন, সেজন্য ব্রোচের নাগরিকদের অনুরোধে এই

পুস্তকটিকে সহজ ভাষায় নূতন করে পরিমার্জন করতে এই অধম—মুহম্মদ বিন্ খতিরুদ্দিন্ সাত্তারীকে তিনি আদেশ করেন। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে বর্তমান সংস্করণটি বাহ্রুল্‌হায়াত নাম দিয়ে এই অধম কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হল।"[৪]

এই ভূমিকায় উল্লিখিত নামগুলি ঐতিহাসিক। আলী মরদান, খল্‌জী বংশীয় তুর্কী সামন্ত ছিলেন যিনি লখ্‌নৌতি বিজেতা ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীকে দেবীকোটে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করে বাংলার মুসলিম শাসিত অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন এবং দিল্লীর কুতবুদ্দিন আইবকের হস্তক্ষেপের ফলে কিছুদিনের জন্য ক্ষমতাচ্যুত হলেও একবৎসরের মধ্যে আবার লখ্‌নৌতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সুলতান খেতাব ধারণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে চেষ্টা করেন। তাঁর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে অমাত্যরা ১২০৮ সালে তাঁকে হত্যা করে।[৫]

কাজী রুকনুদ্দিন 'ইবনে উমেদ' নামে আরবী-ফারসী সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচিত। সুফী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। হাজী খলিফার 'কাষ্‌ফ্‌-উল্‌-জুনুন্' নামক সাহিত্যিকদের জীবনীকোষ গ্রন্থে ইবনে উমেদের মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হয়েছে ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে সামারকান্দে। তাঁর রচনাবলীর তালিকায় অমৃত-কুণ্ডের এই আরবী অনুবাদের উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায় না। তবে ধর্মতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তিকার লেখক বলে তাঁর খ্যাতির কথা আছে। তাঁর একটি পুস্তকের নাম 'কিতাবুল-ইরশাদ্' সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। Dialectics (ইল্‌মুল-খিলাফ-ও-ইল্‌মুল-জুদুল্)-এর উপরেও তাঁর একটি রচনা ছিল।[৬]

হজরত সেখ মুহম্মদ গওস্ — যাঁর আদেশক্রমে বর্তমান ফারসী সংস্করণ তৈরি হয়েছিল বলে ভূমিকায় বলা হয়েছে, আরও সুপরিচিত ব্যক্তি। ইনি প্রথম জীবন গোয়ালিয়রে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হয়। তাঁরই সাহায্যে বাবর গোয়ালিয়র দুর্গ সহজে জয় করতে সমর্থ হন। মোগল রাজবংশের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। হুমায়ুনের তিনি দীক্ষাগুরু ছিলেন; ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে তাঁর দেহান্ত ঘটলে আকবর তাঁর সমাধিতে যে সৌধ নির্মাণ করেন তা এখন গোয়ালিয়রের অন্যতম আকর্ষণ। মুহম্মদ গওসের অধ্যাত্মিক প্রভাবে মিঞা তানসেন আশৈশব লালিত হন এবং গুরুর সমাধির বহিরঙ্গণে তিনিও সমাধিস্থ।[৭]

ভারতের বিভিন্ন সুফী পন্থার মধ্যে সাত্তারী ত্বরীকা এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু ১৫-১৭ শতাব্দী পর্যন্ত এই ত্বরীকা উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতে বেশ বিস্তারলাভ করেছিল। এ পন্থার প্রবর্তক ছিলেন আবদুল্লাহ্ সাত্তারী। ১৪ শতকে তিনি ইরাণ থেকে ভারতে আসেন এবং প্রথমে জৌনপুরে তাঁর ত্বরীকা প্রসারের চেষ্টা করেন পরে মসিওয়ার সুলতান হোশাঙ্ সাহের আমন্ত্রণে মাস্তুতে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানেই তাঁর দেহান্ত ঘটে এবং তাঁর সমাধি জাহাঙ্গীরের আদেশে নির্মিত হয়।[৮] গওস্ গোয়ালিয়রী ছিলেন এই ত্বরীকার অন্যতম পীর। ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বদায়ূনী তাঁর 'মুন্তখা-উৎ-তোওয়ারিখে' গওস্ গোয়ালিয়রী সম্পর্কে দুই পৃষ্ঠা জুড়ে সশ্রদ্ধ বিবরণ লিখেছেন। প্রায় প্রত্যেক সুফী জীবনী-

গ্রন্থেই শেখ গওসের বিবরণ আছে। তিনি নিজেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'গুলজার-ই-আবরার' নামক ভারতীয় সুফীদের বৃত্তান্ত অতি মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ। এর মাত্র একটি পুঁথির অস্তিত্ব জানা গেছে—বর্তমানে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে।[৯]

সাত্তারী পন্থার একটি বিশেষত্ব ছিল নির্জন পর্বতগুহায় বা অরণ্যে দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনা করা ও নানাবিধ যৌগিক প্রক্রিয়া সাধন। এই সাধনার দ্বারা নাকি তাঁরা নানাপ্রকার অলৌকিক কার্যকলাপের ক্ষমতা অর্জন করতেন এবং তার বলে ইরফান বা পরমতত্ত্বজ্ঞানের পথকে সংক্ষিপ্ত করতে পারতেন। সাত্তারী শব্দের অর্থ ক্ষিপ্রগামী; অধ্যাত্মজ্ঞানের স্তরগুলি তিনি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তজ্জন্য বিশেষ সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন বলে আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর গুরু 'সাত্তারী' উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ত্বরীকা তাই সাত্তারী নামে খ্যাত হয়।[১০]

এইরকম অতিপ্রাকৃত কর্মক্ষমতার জন্য মুহম্মদ গওস্ গোয়ালিয়রীরও খ্যাতি ছিল। চুনার অঞ্চলের গিরিগুহায় ও অরণ্যে তিনি একাকী ১২ বৎসর কঠিন তপশ্চারণ ও যোগ-সাধনায় কাটিয়েছিলেন। কামরূপেও যে তিনি গিয়ে কয়েক বৎসর যোগশাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন, সে কথা উপরি-উদ্ধৃত ভূমিকাতেই আছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে তিনি বশ করতে পারতেন বলে তাঁর জীবনীকাররা উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে তস্‌খীরুল্-কওয়াকিব্ অর্থাৎ নক্ষত্র বশ করার পদ্ধতি।[১১]

যে আরবী সংস্করণটি কাজী রুক্‌নুদ্দিন রচনা করেছিলেন বলে উক্ত ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, তার সন্ধান জানা যায় নি। তবে আর একটি আরবী সংস্করণের একাধিক হস্তলিপি পাওয়া গেছে, যাতে কাজী রুক্‌নুদ্দিন ও যোগী পণ্ডিতের উপরি-উক্ত কথোপকথনের হুবহু তর্জমা আছে। এবং কাজী কর্তৃক গ্রন্থোক্ত পদ্ধতি সাধনা ও তার আরবী তর্জমা করার কথাও আছে। কিন্তু তাতে ফারসী অনুবাদের উপরে উদ্ধৃত ভূমিকার মুহম্মদ গওস্ সংক্রান্ত শেষাংশটুকু নাই। এই আরবী সংস্করণের নাম 'আল্-মিরাৎ-উল্ মা'নি ফি ইদ্রাক্ আলেমাল্ ইন্‌সানি।' বাঙলায় এর অর্থ দাঁড়ায়—মানব জগৎ তত্ত্বের রহস্য-মুকুর।[১২]

এই ভূমিকাটির সরল অনুবাদ এই—"ভারতবর্ষীয়দের পণ্ডিতমহলে সুখ্যাত একটি প্রামাণিক পুস্তক আছে তার নাম 'অমৃত-কুণ্ড' অর্থাৎ জীবন-সলিল-কুণ্ড। মুসলমানেরা যখন ভারতের দেশগুলি জয় করে এবং সে দেশে ইসলামের ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশের 'কামরু' অঞ্চলে সে সংবাদ পৌছল। 'কামরু'তে অনেক হিন্দী পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিল। তাদের একজন—নাম ভোজর ব্রাহ্মণ যোগী মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হবার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে লখ্‌নৌতিতে এসে পৌছয়। তখন সুলতান আলী মরদানের রাজত্বকাল। ব্রাহ্মণ শুক্রবারে জুম্মা মসজিদে এসে পণ্ডিতের সন্ধান করতে থাকলে লোকে তাকে কাজী রুক্‌নুদ্দিন সামারকন্দীর

কাছে নিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা করল—'তোমাদের গুরু কে?' তারা সবাই বলল—'মহম্মদ, যিনি আল্লাহর রসুল।' সে আবার জিজ্ঞাসা করল—'আত্মা সম্বন্ধে তোমরা কী বল?' ইমাম বলল—'আত্মা বিধাতার অন্যতম সৃষ্টি।' যোগী বলল—'তুমি সত্য বলেছ, আমরাও ইব্রাহীমদ্বয়ের[১৩] গ্রন্থে ঐরূপ পেয়েছি। দুই ইব্রাহীম হচ্ছেন ইব্রাহীম ও মুসা। যোগী তারপর ইসলাম গ্রহণ করল এবং ইসলামের শাস্ত্রে এমন সুপণ্ডিত হোল যে সবাই তার ফতোয়া দেওয়ার অধিকার স্বীকার করে নিল। সেই যোগী উক্ত কাজীকে এই পুস্তকটি উপঢৌকন স্বরূপ দেয়। কাজী পুস্তকের মর্ম অবগত হয়ে খুব চমৎকৃত হন এবং পুস্তকে বর্ণিত ক্রিয়া সাধনা করে যোগীদের স্তরে পৌছতে সক্ষম হন। তিনি তখন পুস্তকটিকে হিন্দি থেকে ফারসীতে এবং ফারসী থেকে আরবীতে ভাষান্তরিত করেন। পুস্তকটি দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। বর্তমান পুস্তকে তার সম্পূর্ণ বিবরণ অচিরেই দেওয়া হবে।

'পুস্তকটি সেই থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। আমি যখন পুস্তকটির কথা জানলাম ও কোনও তত্ত্বজ্ঞানীর কাছ থেকে তার সাধন প্রণালীর পাঠ নিয়ে তার অদ্ভুত গুণ দেখে আশ্চর্য হয়ে তার গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করার বাসনায় গুরুতর অনুসন্ধান করে নিরাশ হয়েছি এমন সময়ে 'কামরু' দেশ থেকে 'অম্ভুয়া নাথ' নামের এক যোগী এসে উপস্থিত হল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এই যোগী পুস্তকটি তার উপরি-উক্ত গ্রন্থকারের কাছেই দেখেছিল। আমি তখন এই পুস্তকের দশ অধ্যায়ের পঞ্চাশটি শ্লোক হিন্দের ভাষায় যেমন করে পঠিত হয় ঠিক তেমনই করে অম্ভুয়ানাথকে পাঠ করে শোনালাম। সে তখন শ্লোকগুলির গূঢ়ার্থ ও গুণাবলী ব্যাখ্যা করে আমাকে শোনাল, এবং বলল যে এ শাস্ত্রের তত্ত্ব পুস্তক পাঠ করে বোঝা যায় না, এ তত্ত্ব কেবল বক্ষ থেকে বক্ষে সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ গুরুর কাছে দীক্ষা ও তার সাহায্য ব্যতীত এ রহস্যের জ্ঞান হয় না।

'তার পরে পুস্তকটির পাঠ যে ভাবে তাঁর কাছে আমি নিয়েছিলাম, যে ভাবে তাঁর কাছে শুনেছিলাম বা বুঝেছিলাম সেইভাবে তার বর্ণনা করতে তিনি আমাকে অনুমতি দেন, এবং ইচ্ছা জানান পুস্তকটিকে হিন্দী থেকে যেন আরবীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাঁর এই ইচ্ছাকে আদেশ মনে করে কায়মনোবাক্যে তা পালনে আমি প্রবৃত্ত হলাম। অতএব সম্পূর্ণ পুস্তকের মধ্যে চাক্ষুষ দর্শনীয় বস্তুর বর্ণনায় যা আমি মনে রাখতে পেরেছি তা লিপিবদ্ধ করছি; তার গূঢ় তত্ত্বের মধ্যে যা দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা আমি বাদ দিয়েছি। এই পুস্তকের নাম আমি রাখলুম 'আল্‌-মিরাৎ-উল্‌ মা'নি ফি ইদ্রাক্‌ আলেমাল্‌-ইনসানি'। এতে দশটি অধ্যায় আছে। সত্যানুসরণে আল্লাহ্‌র আনুকূল্য পেলে অচিরেই সে অধ্যায়গুলির বর্ণনা দেওয়া যাবে।'[১৪]

এই ভূমিকা বা সংস্করণটি যে কাজী রুকনুদ্দিনের নয় তা সুস্পষ্ট। এবং এই আরবী সংস্করণটি যে মূল গ্রন্থের হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তাও সুস্পষ্ট কেননা

অম্ভুয়ানাথ মূল পুঁথির পঞ্চাশটি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখকের বোধগম্য করে যে সরল বর্ণনা করেছিলেন লেখক তাকেই নিজ ভাষায় আরবী গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ভূমিকার শেষার্ধে যে নাম ও তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে পূর্বোক্ত ফারসী অনুবাদে সে সব নাই। এই আরবী সংস্করণের রচনাকালের উল্লেখ নাই তবে সে কাল যে কাজী রুক্‌নুদ্দিন কৃত অনুবাদের খুব বেশি পরবর্তী নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় কামরূপ থেকে আগত অম্ভুয়ানাথ যোগীর উল্লেখ থেকে, যিনি অমৃত-কুণ্ডের মূল রচয়িতার (অর্থাৎ ভোজর ব্রাহ্মণ যোগী) কাছেই পুস্তকটি দেখেছিলেন বলে বলা হয়েছে। লখনৌতিতে আলী মরদানের রাজত্বকাল হচ্ছে ১২১০-১২১৩ খ্রীষ্টাব্দ, আর কাজী রুক্‌নুদ্দিনের মৃত্যুর তারিখ পাচ্ছি ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দ। 'ভোজর ব্রাহ্মণ' মূল অমৃত-কুণ্ড রচনা ১২১০ সালের পূর্বে সমাপ্ত করলেও তাঁরই সমসাময়িক অম্ভুয়ানাথকর্তৃক দ্বিতীয় আরবী সংস্করণ প্রস্তুত করার উদ্যোগ কাল তার ২৫।৩০ বৎসরের বেশি পরে হওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর হতে পারে না।

এই আরবী সংস্করণকর্তার নামোল্লেখ পুঁথিতে না থাকলেও তিনি যে আসলে বিখ্যাত সুফী দার্শনিক মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী, অন্য সূত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনুল আরবীর জন্ম স্পেনে, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ তিনি মিশর, ইরাক সিরিয়াতে অতিবাহিত করেন, এবং দামাস্কাসে তাঁর দেহান্ত ঘটে ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে। দর্শন ও অধ্যাত্ম বিষয়ে তাঁর রচিত তিন শতাধিক পুস্তক-পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া গেছে তার মধ্যে দুই শতাধিক পুস্তকের সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায়।[১৫] তাঁর রচনাবলীর যে একটি তালিকা ইবনুল আরবী নিজেই দিয়েছেন তাতে উপরি-উক্ত নামে অমৃত-কুণ্ডের এই আরবী সংস্করণটির উল্লেখ প্রায় সকল হস্তলিপিতেই পাওয়া যায়। এবং অমৃত-কুণ্ডের উল্লেখ তার অন্য রচনাতেও আছে।[১৬]

ইবনুল আরবী অবশ্য ভারতে কখনও আসেন নি এবং তিনি যে ভারতীয় ভাষা জানতেন তেমন কোনও আভাসও নাই। কামরূপাগত অম্ভুয়ানাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ দামাস্কাসে নয়তো মধ্যপ্রাচ্যেরই নিকটস্থ কোনও স্থানে হয়ে থাকবে। এরূপ সাক্ষাৎ যে মোটেই বিচিত্র নয় বরঞ্চ সে যুগের পক্ষে অতি সাধারণ ঘটনা, তার বহু উদাহরণ ও ইঙ্গিত সমসাময়িক আরবী রচনাতেই পাওয়া যায়। ইরান ইরাক সিরিয়া ও মিশরের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগী সন্ন্যাসী, দার্শনিক, জ্যোতিষী, চিকিৎসক প্রভৃতির যাতায়াত খ্রীষ্টীয় ৮ শতক থেকেই ছিল তার কিছু প্রমাণ ও বিবরণ সুলেমান নদ্‌ভী তাঁর পুস্তকে একত্রিত করেছেন।[১৭] অম্ভুয়ানাথ এইরূপ একজন যোগী পর্যটক, যাঁর সাথে ইবনুল আরবীর সাক্ষাৎ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

ইবনুল আরবী মুসলিম অধ্যাত্মবাদের যুগপ্রবর্তক ছিলেন। সুফী লেখকরা তাঁকে শেখ-উল্ আক্‌বর অর্থাৎ গুরুশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের যে রূপ ও ব্যাখ্যা তিনি তাঁর রচনায় ও নিজ সাধনায় উপস্থাপিত করেন তাকে সর্বেশ্বরবাদ

(Pantheism) বলা চলে, সুফীদর্শনের ভাষায় তার নাম 'ওয়াহ্‌দাতুল-ওয়াজুদ' অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ।[১৮] এই মতবাদকে তিনি যুক্তি দর্শন ও স্বীয় সাধনার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিস্তারিত করেছেন যদিও অধ্যাত্ম সাধনায় ইরানের বিখ্যাত সুফী আবু ইয়াজিদ বিস্তামি (৮৭৮ খ্রীঃ) ছিলেন সর্বেশ্বরবাদের অন্যতম সাধক যিনি আবু আলী সিন্ধি নামক একজন আরবী-অনভিজ্ঞ ভারতীয়ের কাছে অধ্যাত্মবাদের দীক্ষা নিয়েছিলেন।[১৯] ইবনুল আরবীর সময় থেকে এবং তাঁর শিক্ষা ও সাধনার গুণে মুসলিম অধ্যাত্মচিন্তায় সর্বেশ্বরবাদ বদ্ধমূল হয় এবং ইরান ও ভারতের সুফী সাধনায় প্রধানতম ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সুফীতত্ত্বকে জালালুদ্দিন রুমী গভীর হৃদয়াবেগে রূপান্তরিত করে আরও বিস্তৃত করেন। (এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল, বিশেষ করে ভারতবর্ষে যা জাহাঙ্গীরের সময় থেকে আহমদ সরহিন্দির চেষ্টায় নক্সবন্দিয়া তরীকার মাধ্যমে চূড়ান্ত দ্বৈতবাদকে সুফী চিন্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে)।

ইবনুল আরবীর অধ্যাত্ম চিন্তায় বিভিন্ন প্রকারের বহু ধর্মদর্শনের সংযোগ সুস্পষ্ট, যেমন অবতারবাদ কিংবা মানুষ ও ঈশ্বরের ঐক্যভাব। তার জন্য জীবদ্দশাতে সনাতন ইসলামদ্রোহিতার অপবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। 'ফসুসুল-হিকম্' নামে তাঁর একটি সুপ্রচারিত পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি আত্মদর্শনকে ভগবদ্দর্শনের উপায় হিসাবে ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নিজ দেহ মনের রহস্য বুঝতে পারলেই স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের রহস্য উপলব্ধি করতে পারা যায়'। মানুষই বিশ্বজগতের ক্ষুদ্রায়িত রূপ (microcosm), সৃষ্টি ও স্রষ্টার সমস্ত গুণই যার মধ্যে আছে এবং যা ঈশ্বর-স্বরূপ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মৌলিক উপাদান ও আকৃতি (archetype); মানুষের মধ্যেই স্রষ্টা নিজেকে ঘোষণা করেন, তার চোখ দিয়েই তিনি নিজ সৃষ্টি অবলোকন করেন।[২০]

এ-সব তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার সম্পর্ক আছে কি নাই তা নির্ণয় করা আমার সাধ্যাতীত এবং এ প্রবন্ধের জন্য অপ্রাসঙ্গিকও বটে। তবে ভারতীয় যোগতত্ত্ব, বিশেষ করে যোগীদের সাধন পদ্ধতি ও নানাবিধ ক্ষমতার কাহিনী ৯-১০ শতক থেকে আরব দেশগুলিতে বেশ প্রচলিত ছিল; ১২ শতকের শেষের দিকে নিম্ন ইরাকের কোনও শহরে অনুলিখিত ও চিত্রিত পঞ্চতন্ত্রের একটি আরবী সংস্করণের পুঁথিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট কৌপীন পরিহিত জটাধারী যে কয়টি পুরুষের চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তা ভারতীয় যোগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কারও হতে পারে না।[২১] অমৃত-কুণ্ডের আরবী সংস্করণ যে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে বেশ প্রচার লাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নাই। মুহম্মদ আল্-মিস্‌রী নামক মিশরের ইল্‌হামিয়া সুফী তরীকার একজন লেখক ১৫ শতকে মুসলিম অধ্যাত্মবাদের বিবরণ দিতে গিয়ে অমৃত-কুণ্ডের উল্লেখ করে বলেছেন যে ভারতীয় সুফী সাধনায় যোগ হচ্ছে এক অপরিহার্য অঙ্গ।[২২]

মোগল যুগে ভারতবর্ষে এই পুস্তকের সমাদর কী পরিমাণ ছিল তার আভাস পাওয়া যায় Dublin-এর Chester Beatty-র সংগ্রহে রক্ষিত খতিরুদ্দিন সাত্তারীকৃত ফারসী

সংস্করণের একটি পুঁথি থেকে, যা ১৭ শতকের গোড়ার দিকে অনুলিখিত হয়; তাতে মোগল শৈলীতে আঁকা পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হঠযোগের ছয়টি আসনের চিত্র দেওয়া আছে।[২৩]

আওরঙজেবের রাজ্যকালের প্রথম দিকে 'দবিস্তান-উল্ মজহিব্' নামক বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বালোচনার যে মূল্যবান গ্রন্থ ফারসী ভাষায় মির্জা মুহসিন ফানি রচনা করেন তাতে ভারতীয় যোগতত্ত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে গোরক্ষসংহিতার সঙ্গে অমৃত-কুণ্ডেরও উল্লেখ করা হয়েছে। অমৃত-কুণ্ডের ফারসী অনুবাদ মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন— ফারসী অমৃত-কুণ্ডে লেখা আছে যে "গোরক্ষনাথ আসলে খিজির আর মৎস্যেন্দ্র হচ্ছেন ইউনুস ('পয়গম্বর') এ কথা কিন্তু আসল অমৃত-কুণ্ডে নাই।" গ্রন্থকার কয়েকজন সমসাময়িক যোগীর নামও করেছেন যাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল— যেমন বালকনাথ তপস্বী, অম্বরনাথ, সগঙ্গানাথ, সুরজনাথ। এঁরা খুব সম্ভব নাথপন্থী যোগী।[২৪]

অমৃত-কুণ্ডের উপরি-উক্ত দ্বিতীয় আরবী সংস্করণের অধ্যায়সূচী এই—

ভূমিকা

১ ক্ষুদ্রতম বিশ্বের বিবরণ
২ ক্ষুদ্রতম বিশ্বের অন্তর্গত বস্তুসমূহের লক্ষণ ও প্রভাব বর্ণনা
৩ হৃদয়ের (heart) প্রকৃতি ও তার রহস্য
৪ যোগাভ্যাসের তাৎপর্য
৫ প্রাণায়ামের প্রকৃতি ও প্রাণের অবস্থান
৬ বীর্যরক্ষার তাৎপর্য
৭ যোগসাধনপদ্ধতি
৮ মৃত্যুর লক্ষণ ও তার প্রতিরোধ প্রণালী
৯ অশরীরী জীবসকলকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি
১০ উপসংহার

প্রাচীনতম পুথিতে আরও একটি অধ্যায় আছে, আত্মার আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে। উপরি-উক্ত ফারসী সংস্করণের অধ্যায়গুলির সঙ্গে আরবী সংস্করণের হুবহু মিল আছে, কেবল আত্মার আকৃতিবিষয়ক অতিরিক্ত অধ্যায়টি নাই।

আরবী সংস্করণের কয়েকটি প্রাচীন পুঁথিতে আরও একটি ছোট প্রবন্ধ জুড়ে দেওয়া হয়েছে যা অন্য আরবী বা ফারসী পুঁথিতে নাই। প্রবন্ধটি স্বাক্ষরবিহীন। যোগ ও তন্ত্রবিষয়ক পুস্তকটি নকল করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ এটি রচিত মনে হয়।[২৫] 'যে নিজেকে চেনে সে স্রষ্টাকে চেনে', হজরত মুহম্মদের এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতামত নিয়ে এই প্রবন্ধ রচিত এবং তার শেষে লিখিত—"সামারকন্দীর হওজুল্-হায়াতের সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা শেষ হল"।—এই কথা থেকে মনে হয় নিবন্ধটি কোনও অজ্ঞাতনামা

লিপিকারের নিজস্ব যোজনা। যে সব পণ্ডিতদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছেন কুতুল-কলুব্ নামক অধ্যাত্ম দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা মক্কার আবু তালিব (মৃত্যু ৯৯৬ খ্রী.)।[২৬] আর সর্বাধুনিক হচ্ছেন অধ্যাত্মবাদের প্রবলতম ও প্রধানতম বিরোধী, ওয়াহাবী মতবাদের আদিগুরু দামাস্কাসের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ইব্নে তাইমিয়া (মৃত্যু ১৪০৬ খ্রী.)।[২৭] কাজেই এই যোজনাটুকু ১৫ শতকের পুর্বে রচিত হতে পারে না।

হওজুল-হায়াত নামে অমৃতকুণ্ডের এই আরবী সংস্করণের পাঠ ইউসুফ হুসেন সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।[২৮] তার থেকে কয়েকটি অধ্যায়ের সারাংশ সরল অনুবাদে নীচে উদ্ধৃত করছি।

পুস্তকের প্রারম্ভে মূল গ্রন্থকার আত্মার দেহপরিক্রমণের, তার যাত্রার আরম্ভ ও শেষ হওয়ার যে একটি কাহিনী দিয়েছেন বলে অভুয়ানাথ বলেছিলেন, সে কাহিনীর সারাংশ নিজ ভাষায় সংস্করণরচয়িতা অধ্যায় আরম্ভের পূর্বে মুখবন্ধ হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটি আত্মার নিজের উক্তি, প্রথম পুরুষে বর্ণিত—

"আমি আদিরাজ্যে থাকতাম, যেখানে আমার পিতৃ-পিতামহের আবাস ছিল। রাজ্যের অধীশ্বর আমাকে ডেকে বললেন—পরিমিত আয়ুপ্রাপ্ত জীবদের দেশ ভ্রমণ না করে আসা পর্যন্ত এই রাজ্যে বাস করা সিদ্ধ হবে না। সে দেশ আমার রাজ্যের শেষ প্রান্তে। তুমি যেন কখনও—'আমি কি তোমার প্রভু নই?'—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে উচ্চারিত তোমার অঙ্গীকার বিস্মৃত হোয়ো না।[২৯] কেন না, সে দেশেও তুমি আমাকে পাবে। সে দেশের বিবরণ তুমি আমার মন্ত্রীর কাছে জেনে নাও, যে আমার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যার অজান্তে কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারে না, আর যার অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ বার হতে পারে না।

"আমি দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলে দ্বারীকে অভিবাদন করলাম, তিনি প্রত্যাভিবাদন করলেন। আমি বললাম—আমার প্রভু ও নাথ আদেশ করেছেন পরিমিত আয়ুপ্রাপ্ত জীবদের দেশে যাত্রা করতে। তিনি বললেন, যাত্রাপথ অত্যন্ত কষ্টকর ও বিঘ্নসংকুল, আর প্রত্যাবর্তনের পথ আরও কঠিন। সেজন্য আমার আশঙ্কা হয়, তুমি পথের দূরত্ব ও কষ্টের মধ্যে পড়ে তোমার অঙ্গীকার ভুলে যাবে, আর অনন্তকাল বিচ্ছেদ যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকবে। আমি বললাম,—'যাত্রা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই, অতএব সে দেশের বিবরণ ও তার পথ আমাকে বলে দাও। তিনি বললেন—ভাল করে আমার কথাগুলি শোন, আমার উপদেশ কখনও ভুলো না, কেন না তুমি আমাকে ও আমার প্রভুকেও ঐ দেশে পাবে।

"তোমার যাত্রাপথের প্রথম প্রতিবন্ধক হবে দুইটি নদী। সে দুইটি নদী হচ্ছে মন ও স্বভাব (হাওয়া)। তারপরে পড়বে সাতটি পর্বত, তিনটি চড়াই আর ভয়ংকর বিপদ-সংকুল তিনটি স্থান। তারপরে তুমি একটি সংকীর্ণ বর্ত্মে পৌছবে—যা পিপীলিকার চোখের

চেয়েও সংকীর্ণতর—যেখানে তোমাকে মস্তকের উপরে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে। এইসব সংকট পার হবার পর তুমি সেই নগরে পৌছবে। দেখবে নগরের দুইটি প্রবেশ পথ আছে —একটি বাহিরের আর একটি ভিতরের। প্রথম দ্বারে তুমি একজনকে দেখবে, সে হচ্ছে "স্পর্শ", রক্ত প্রবাহের ওপরে তার আসন স্থাপিত। ঐ নগরের শাসন ক্ষমতা, তার মঙ্গলামঙ্গল তার হাতে। দ্বিতীয় দ্বারে আর একজনকে দেখবে, "দর্শন", জলের উপরে তার আসন। সে হচ্ছে ঐ নগরের নাজির। তৃতীয় দ্বারে আর একজনকে দেখবে, সে "শ্রবণ", তার আসন অগ্নিতে, সে হচ্ছে নগরের গুপ্তচর। চতুর্থ দ্বারে আর একজনকে পাবে, সে "আস্বাদ", তার আসনও জলের উপর স্থাপিত। ঐ নগর প্রবেশের অনুমতি দেওয়া তার অধিকারে। পঞ্চম দ্বারে যে আছে সে "আঘ্রাণ", তার আসন প্রবল ভোগেচ্ছায়। সে হচ্ছে ঐ নগরের স্থপতি।'

"আর, দ্বিতীয় প্রবেশ পথেও পাঁচটি তোরণ আছে। প্রথম তোরণ "সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি"। সেখানে একজনকে পাবে জলের উপরে উপবিষ্ট। তার প্রকৃতিতে আর্দ্রতা বেশি; বিস্মৃতি তার উপরে প্রবল। নগরের কোনও কঠিন সমস্যা তার কাছে উপস্থাপিত হলে সে তৎক্ষণাৎ সমাধান করে দেয় বটে, কিন্তু সে সমাধানকে স্থায়িত্ব দিতে সে পারে না। দ্বিতীয় তোরণে আর একজনকে দেখবে, সে "চিন্তা" তার আসন অগ্নিতে; তার প্রকৃতিতে শুষ্কতা বেশি। তার বোধশক্তি বিলম্বিত। তবে একবার বুঝলে সে কখনও বিস্মৃত হয় না, সর্বদা তা স্মরণে রাখে। তৃতীয় দ্বারে যাকে পাবে সে "মোহ", তার আসন কামনাতে তার স্বভাব শীতলতার পক্ষপাতী; ঐ স্বভাবে সে মিথ্যা বলে, দোষারোপ ও প্রবঞ্চনা করে। আর যা সে বোঝে না তাই করতে আদেশ করে। তার প্রতি মনোযোগ দিও না। চতুর্থ দ্বারে যাকে দেখবে সে হচ্ছে "কল্পনা বা ভাবনা" (concept); তার আসন অগ্নিতে, প্রকৃতি উষ্ণ; কখনও তার স্বভাব দেবতার মত কখনও বা দানব ও অসুরের মত হয়। সে বস্তুকে যুক্ত করে, বিযুক্তও করে। নগরের নানাবিধ আশ্চর্য বস্তু তার অধিকারে যেমন কিমিয়া, যাদু, প্রহেলিকা ও সব রকম কারিগরী বিদ্যা। সে হচ্ছে নগরের যন্ত্রী। সাবধান থেকো। তোমাকে সে ডুবিয়ে দিতে পারে। পঞ্চম দ্বারে যাকে পাবে, সে হচ্ছে স্মরণ-শক্তি। তার আসন ভূমিতে, তার স্বভাব মধ্যমপন্থী; তার উপরে শঠতা ও ছলনা প্রবল। সে হচ্ছে নগররক্ষী, দ্বারীদের কার্য সে পরিচালনা করে।

নগরে প্রবেশ করার পর তুমি সাতজন লোক দেখবে। একজন অগ্নি জ্বালছে; সে হচ্ছে শোধক। দ্বিতীয়জন রান্না করছে; সে স্মারক। তৃতীয়জন ধারক; রান্না পাক করার সময়ে ধারণ করে থাকে। চতুর্থজন পাচক, সে খাদ্যকে যথাযোগ্যভাবে বিতরণ করে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তু সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে, আর স্থূল বস্তু স্থূল প্রকৃতিকে দেয়। পঞ্চম জনের কাছে যা পৌছায় সে তাকে পরিবর্তিত করে নিজের মত, অর্থাৎ পুষ্টিতে পরিণত করে নেয়। ষষ্ঠজন খাদ্যের উদ্বৃত্ত ও উচ্ছিষ্ট অংশ বাইরে ফেলে দেয়। আর সপ্তম জন আর

একটি নগর সৃষ্টি করার সরঞ্জাম প্রস্তুত করে ; সে সরঞ্জাম হচ্ছে প্রজনন। সেখানে তুমি একটি ভয়ংকর শার্দুল দেখবে ; সে হচ্ছে প্রজননের সম্মোহনী শক্তি।

এইসব লক্ষণ যখন তুমি প্রত্যক্ষ করবে, এইসব কার্যগুণের যখন তোমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হবে তখনই তুমি তোমার সমস্ত পুর্ব প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প বিস্মৃত হবে। তার কিছুই তোমার মনে থাকবে না। অতএব নগরে প্রবেশের পর সতর্ক থাকবে। নচেৎ অনন্তকাল দুঃখকষ্টে পড়ে থাকবে।'

"আমি তখন যাত্রা করে বর্ণনামত গিরি নদী প্রভৃতি পার হয়ে সেই দেশে পৌছলাম। সেখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে সেখানকার নাগরিক হয়ে নগরের নিয়মকানুন সম্পূর্ণরূপে পালন করতে শিখে গেলাম। তখনও আমার পুর্ব-প্রতিজ্ঞার কিছু কিছু আমার স্মরণে আছে। নগরের আবিলতা ও নির্মলতার মধ্যে ঘোরাফেরা করছি এমন সময়ে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট এক প্রাচীন ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি ঐ নগরের অধিপতি। আমি তাকে অভিবাদন করতে তিনি আমারই অভিবাদনের পুনরুক্তি করলেন ; তাঁকে আমি যা বললাম তিনিও ঠিক সেই কথাগুলিই পুনরুচ্চারণ করলেন। আমি যা বলি, যা করি, তিনিও ঠিক তাই বলেন ও করেন। তখন ভাল করে লক্ষ করতে দেখি যে তিনিই আমি, এবং এই প্রাচীন ব্যক্তি আমারই প্রতিবিম্ব।[৩০] এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার দরুণ আমার বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করলাম ও পুর্বপ্রতিজ্ঞা আমার মনে পড়ে গেল। আমি যখন এই ভাবে বিস্ময়াভিভূত, সেই মুহূর্তে আমার প্রভুর মন্ত্রীর দেখা পেলাম যিনি আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উপদেশদান করেছিলেন। আমার হাত ধরে তিনি বললেন এই সলিলে অবগাহন কর। এ হচ্ছে জীবন-সলিল বা অমৃত। সে জলে ডুব দেওয়া মাত্র প্রভুর সত্তার সমস্ত রহস্য আমার মনে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং উপরি-উক্ত (নাগরিকতার) সমস্ত লক্ষণ জ্ঞাত হবার ও সে সব লক্ষণের বর্জন করার পর আমি আমার স্রষ্টা ও প্রভুকে পেলাম। তিনি বললেন—স্বাগত, তুমি আমারই অংশ। তিনি তাঁর সঙ্গে আমার মিলনের ও নিরাপদে আমার আসল দেশে প্রত্যাগত হবার সুসংবাদ দিলেন।

এসব হচ্ছে পরিত্রাণ ও অনন্ত সৌজন্য লাভ করার সংকেত। যে বিবেকের বলে মানুষ পশুর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে সে বিচারশক্তিসম্পন্ন বিবেকের পুর্ণজ্ঞান ব্যতীত সে পরিত্রাণ বা সৌভাগ্য লাভ, কখনও সম্পুর্ণ রূপে হতে পারে না।[৩১]

সপ্তম অধ্যায়॥ যোগসাধনা। "জ্ঞাত হও, যে বৃহৎ বিশ্বে যা আছে ক্ষুদ্র বিশ্বেও তা আছে। কেবল, ক্ষুদ্রতর বিশ্বে চিন্তা বা মনন দ্বারা যা স্থির হয় পরে কর্ম দ্বারা তাকে প্রকাশ করা হয়। এই মনন বা চিন্তা সকল বিষয়েই প্রযোজ্য। এমন-কি পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই মননকেই বিশ্বাস, প্রত্যয়, ধারণা, যোগ, ধ্যান বা চিন্তা, ভাব ও কল্পনা বলা হয়। যেমন একই বস্তুকে বহু নামে অভিহিত করা হয়। তাই যোগবলে ডিম্ব উপস্থিত করা যায়। মুণ্ডক বা ডিম্বকে পাখিতে পরিণত করা যায় মানতপুরণ, মারণ-

উচাটন, ইন্দ্রজাল, মন্ত্রতন্ত্র, দৈবসংবাদ (oracle) প্রভৃতি সব কিছুরই ফলশ্রুতি যোগ বলেই হয়ে থাকে। কল্পনার এই শক্তি হচ্ছে হৃদয়রহস্যের গুহ্য তত্ত্ব। তোমার এই শক্তি যথার্থ জাগরিত হলে তুমি যা চাইবে তা-ই পাবে।

সে শক্তি যদি তুমি চাও তা হলে যে সাতটি চিত্রের (diagram বা ধারণী ?) কথা এখন বলব, সেগুলি তোমাকে অবলম্বন করতে হবে। একটি কাষ্ঠ কলম কিংবা শাদা কোন পত্র নিয়ে তাতে যে তোমার নির্বাচিত চিত্রটি অত্র বর্ণিত রঙে আঁকবে; তৎপরে চিত্রটি নিরীক্ষণ করতে থাকবে যতক্ষণ না তোমার তার বাহ্যিক আকৃতির পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ না হয়। চিত্রের গুহ্য আকৃতিও তোমাকে তার পরে পত্র বর্ণিত বিশেষ আধারে (বা চক্র) স্থিতরূপে ধ্যান করতে হবে। জ্ঞানীদের সবাই একমত যে মারণ-উচাটন, মানত, চক্র জাদু, বা সম্মোহন, সবেতেই রেখায় নয়তো শব্দে নয়তো অর্থে, এই সাতটি বীজমন্ত্র কোনো না কোনো প্রকারে থাকতেই হবে, নইলে সে সবের কোনো ফল হবে না। আমাদের মধ্যে যেমন ইস্‌মে আজম্‌ এগুলি হচ্ছে ওদের তেমনই অতি শক্তিশালী মন্ত্র। ওরা বলে এই সাতটি চিত্রের (ধারণীর ?) প্রত্যেকটিতেই বিভিন্ন মানব স্বরের এক-একটির বিশেষ স্থান আছে। মায়া সাধনার সময়ে মন্ত্রগুলি অন্তরে অন্তরে উচ্চারণ করতে হয়, জিহ্বা দ্বারা নয়।

প্রথম বীজমন্ত্র হচ্ছে 'হোম' (হোং ?) তার অর্থ 'হে প্রভু'। প্রথম চিত্রটির[৩২] আসন (আধার) হচ্ছে গুহ্য দেশ; তার আসল বর্ণ কৃষ্ণ, বাহ্যতঃ হেম কাঞ্চন বর্ণ। এটি শনির নিযুক্ত। এই চিত্রটিকে তার আসল বর্ণে ও নিজ আসনে স্থিতরূপে ধ্যান করবে। এবং ধ্যানকালে হোমমন্ত্র অন্তরে অন্তরে জপ করতে থাকবে, এবং হৃদয় ও মনশ্চক্ষু যেন চিত্রটিকে মূলাধারে প্রত্যক্ষ করছে এমন ভাবে এই সাধনকালে একাগ্রচিত্ত থাকবে। এই ধ্যানবলে আত্মপর ও নিকট-দূরের পারম্পর্য অন্তর্হিত হয়ে বাহ্যরূপ লোপ পাবে, এবং হৃদয় তার আসল গুণ উপলব্ধি করবে। ফলে যে তাকে দেখবে সে স্বতই তাকে ভালবাসবে। মানুষ তার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করবে, সে নিজ জীবনে মন্ত্রসিদ্ধি ও সম্মোহন ক্ষমতার প্রমাণ পাবে ও সকল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় বীজমন্ত্র হচ্ছে 'ওম্‌' (ওং) অর্থাৎ হে আদি। তার ত্রিভুজটির[৩২] তিনকোণ সমান হতে হবে, তার আধার গুহ্যদেশ ও অণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে; বর্ণ সিঁদুরের ন্যায়, তবে উপরিভাগ অগ্নিশিখার রঙ, এটি মঙ্গল গ্রহের প্রতিভূ।

তার নিজ আধারে পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়ায় এই চিত্রকে ধ্যান করলে কোনও শত্রু থাকবে না। প্রতিপক্ষমাত্রেই তার কাছে নত হবে, সকল মানুষ তাকে ভয় করবে, তার প্রভাব সবাই স্বীকার করবে।

তৃতীয় বীজমন্ত্র রহিন (?) (হ্রীং ?) অর্থাৎ হে স্রষ্টা। এর নাম হকারম (হুংকারং ?), তার আধার নাভীমূল; আসল রঙ পীতবর্ণের, কিন্তু প্রদীপের ন্যায় দীপ্ত।

এটি হচ্ছে বৃহস্পতির প্রতীক। তার বলে দূরশ্রবণ, নিমেষ মধ্যে দূর অতিক্রমণ, ও শিক্ষা দ্বারা যার জ্ঞান হয় না তার গূঢ়ার্থ স্পষ্ট হবে।

চতুর্থ বীজমন্ত্র 'বরীন সরীন' (ব্রীং স্ত্রীং ?) অর্থ, হে করুণাময়, হে দয়াময়। চতুর্থ চিত্রটির আধার হৃদয়; পীতাভ লাল রঙ কিন্তু চিত্রের মধ্যে উন্নত বজ্রের মত প্রভাময়; সূর্যের প্রতীক। এই সমগ্র পাঠ ও চিত্রসাধনের ফলে দেবতাদের কথা শোনার ক্ষমতা জন্মাবে, অতীন্দ্রিয় বলে অদৃশ্য বস্তু দৃষ্টিগোচর হবে।

তন্ত্রসাধনার পঞ্চম বীজমন্ত্র হচ্ছে 'বরায়': হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। আধার কণ্ঠনালী। আসল বর্ণ শ্বেত কিন্তু চিত্রমধ্যে অগ্নির ন্যায়। এটি শুক্রের প্রতীক। এই চিত্র ও মন্ত্র সাধন করলে জীবন সুষমামণ্ডিত হবে, ভূত প্রেত ও মানুষ, বিশেষ করে রমণী তার অনুরাগী হবে।

ষষ্ঠ মন্ত্র যোম (যং)—হে মহাজ্ঞানী; আধার ললাট, দুই ভ্রূর কেন্দ্রস্থিত নাসামূল; আসল বর্ণ[৩৩] কিন্তু নিজ আধারে বিদ্যুৎ ছটার ন্যায় দীপ্ত, বুধগ্রহের প্রতীক। এই চিত্রসাধন করলে চিন্তামাত্র সমস্ত বস্তুর গুণাগুণ ও তার রহস্যকে জানতে পারবে, সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারবে, মানুষ ও প্রেত সবাই নিয়ত তার সেবা করবে।

সপ্তম মন্ত্র 'হংসেশ্ব' হে সঞ্জীবক। আধার ব্রহ্মরন্ধ্র (মস্তিষ্ক) আসল বর্ণ শ্বেত। কিন্তু নিজ আধারে প্রবাহিত জলধারার ন্যায় ও তার মধ্যে বীর্যের ন্যায় একপ্রকার সত্ত্ব (অমৃত ?) মস্তক থেকে পদতল পর্যন্ত ক্ষরিত হচ্ছে। চন্দ্রের প্রতীক। ...শত্রুর অন্যায় কর্ম রোধ করতে যদি চাও তাহলে এই সপ্তম চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের মধ্যে অঙ্কন কর। তার সঙ্গে শত্রুর নাম ও তার প্রতিকৃতিও ঐ দুই ধারণীর মধ্যে আঁক। তারপরে প্রথম চিত্র তার নিজ আধারে ও নিজ বর্ণে বর্ণিত পদ্ধতিতে ধ্যান কর। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

জেনে রাখ, তন্ত্রসাধনায় চিত্রের বা ধারণীর এই সব বর্ণের বিশেষ শক্তি আছে। কৃষ্ণবর্ণে যেমন মারণের শক্তি, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় ধারণীতে; লাল রঙ সব ধারণীতেই সম্মোহন ক্ষমতা দান করে, কেবল চতুর্থ ধারণীতে লাল রঙ সম্মোহন ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। সব চিত্রেই পীতবর্ণ রোগ, বিচ্ছেদ ও ক্ষমতা লোপের প্রভাব সঞ্চার করে। কেবল ষষ্ঠ ও সপ্তম ধারণীতে পীত বর্ণের ক্রিয়া হচ্ছে আরোগ্যলাভ, বিষনাশ ও মূর্ছাভঙ্গ।...মারণ, রোগসৃষ্টি ও ক্ষমতা-নাশক ক্রিয়ার জন্য পশ্চিম দিকে মুখ করতে হবে, আর আরোগ্য ও বশীকরণের জন্য পূর্ব দিকে মুখ করে উপরে বর্ণিত[৩৪] প্রথম আসনে বসতে হবে।

নিজেকে ইচ্ছামত অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত করতে যে চায় ও দৈত্য দেবতার ক্ষমতা লাভ করতে যে চায় তার উচিত এই পুস্তিকার পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত গুণাবলীতে নিজেকে ভূষিত করা, স্ত্রীসঙ্গম একেবারে বর্জন করা, ললাটের দক্ষিণ ভ্রূতে উদীয়মান

সূর্যের আকৃতি আর বাম ভ্রূতে চতুর্দশীর চন্দ্রগোলক অঙ্কন করা। আর ললাটের কেন্দ্রস্থলে সে চিত্রগুলির মধ্যে একটি চিত্র আঁকবে, যেন তার মাথা নীচের দিকে আর দুই ভুজ ভিতরের দিকে থাকে; আর বাকি ছয়টি চিত্র তাদের নিজস্ব রঙে উপরোক্ত তিনটি আকৃতির চতুর্দিকে এই ভাবে আঁকবে[৩২]...। তার পর ধ্যানস্থ হয়ে মানসনেত্রে সেগুলিকে অবলোকন করতে থাকবে যেন চর্মচক্ষুতে সেগুলিকে প্রত্যক্ষ করছে। এবং এই মন্ত্র পড়তে থাকবে—হোং ওং হ্রীং ব্রীং শ্রীং বরানাঃ।" তখন তার উপর ক্রিয়াযোগের আরম্ভ হবে, গভীর রহস্যের মধ্যে সে নিমজ্জিত হবে। তখন তার শিষ্য, ভ্রাতা কিংবা বন্ধুর উচিত যে তাকে এই দশায় দেখলে তার দুই পা ছুঁয়ে দেখা, শীতল থাকলে ধীরে ধীরে মালিস করতে হবে যাতে তার জ্ঞান ফিরে আসে, নইলে অনেকক্ষণ পরে তার চেতনা হবে। এই প্রক্রিয়ায় তার যোগসাধনা সিদ্ধ হলে সে ইচ্ছামত যে কোনও প্রাণীর দেহ ধারণ করতে পারবে ও আবার নিজদেহে ফিরে আসতে পারবে মৃত বা জীবিত অন্য লোকের দেহে প্রবেশ করতে পারবে।"

নবম পরিচ্ছেদ—আধ্যাত্মিক প্রাণী বশ করার নিয়ম।

"বৃহত্তর জগতে ছোট, বড় ও তাদের অনুচরাদি নিয়ে সাতটি আধ্যাত্মিক জীব আছে; তন্মধ্যে ছয়টির প্রত্যেকের জীবনে নয়টি করে, আর একটির অধীনে দশটি অশরীরী প্রাণী আছে। এরা হচ্ছে ৬৩ আধ্যাত্মিক জীব ও তাদের অনুচরবর্গ (যোগিনী-ডাকিনী) তা ছাড়া আরও আছে, তাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই।

ক্ষুদ্র জগতেও এই রকম। তুমি যদি ক্ষুদ্র জগতের এই সব অশরীরী জীবদিগকে আহ্বান করতে চাও, তাহলে শ্বেতচন্দনের কাষ্ঠফলকে তোমার প্রদর্শিত জীবের অত্র বর্ণিত আকৃতি অনুযায়ী ছবি আঁক; একটি শূন্য গৃহে প্রবেশ কর, যা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, যাতে ধুপ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, যা পুষ্পচচিত ও গোলাপজলে সুরভিত। প্রথমে নিজের উপবেশন ও দণ্ডায়মান হওয়ার মত একটু স্থান শাদা রেখা দিয়ে চক্রাকারে ঘিরে নেবে, এবং সে রেখা টানার সময়ে এই মন্ত্র কয়টি সাতবার আবৃত্তি করতে থাকবে: ওং হোম্, অলখ ধৃতি মাতি (ধরিত্রিমাতৃ?) বিশ্বঃ অলখ গোরক্ষ, হোম রাক রাখ্ মীন্‌টোবী রাস নৌত সোয়াল রহীণ হেয়াওস (? হে বজ্র?) ফারস (যাষাহক?) কৃপান এরস নূং নূং, হৃধ্ হৃধ্ (?) ওকাওস (?) অনূহ তানহ (?) ক্রিয়াভঃ চকাবসৈ (?) পরমাহন দ্বাদশ ওম হর হর হর। এই মন্ত্র সাত বার উচ্চারণ করবে আর নিজ অঙ্গে ও পরিচ্ছদে ফুৎকার দেবে। নিজদেহ শুচিশুদ্ধ থাকতে হবে, মনে ক্ষোভ বা দোষ থাকবে না, সেই সময়ে কোনও প্রাণীকে কষ্ট দেবে না; তা করলে আধ্যাত্মিক জীবরা তোমাকে কঠিন কষ্টে ফেলবে।

এই অশরীরী জীবদের প্রথমতম হচ্ছে শনিকে বশ করার প্রতিভূ (agent), নাম 'কালিকা'। তার বর্ণ কৃষ্ণ, চতুর্ভুজা, অনিন্দ্যসুন্দরী, কিন্তু ভয়ঙ্করী। তার আবির্ভাবে তুমি ভয় পাবে। সেই মুহূর্তে তাই তোমাকে প্রশান্তচিত্ত ও ভয়শূন্য থাকতে হবে, কেননা

ভয় করলেই তার অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করবে। 'কালিকা' বর দিতে বিলম্ব করে না; তার সাধনমন্ত্র প্রতিদিন তিন হাজার বার পড়তে হবে, তাহলে সপ্তম দিনে সে আবির্ভূতা হবে। তুমি প্রথমে তাকে সম্বোধন কোরো না, যতক্ষণ না সে নিজ থেকে তোমাকে কিছু বলে। তুমি যেন তার রূপে আত্মহারা হোয়ো না, কেন না সে তোমাকে উৎসাহিত করবে কিন্তু তার দেহের সান্নিধ্য পাওয়ার ক্ষমতা তোমার কখনও হবে না। তুমি কেবল নিজ কামনায় বন্দী হয়ে থাকবে! সেজন্য তার দেহের দিকে তুমি মনোযোগ দিও না। সে যখন তোমার সঙ্গে কথা বলবে তখন তুমি বলবে তুমি আমার মাতা ও ভগ্নী, আমাকে তোমার পুত্র ও ভ্রাতা বলে গ্রহণ করো। সে তাতে সম্মত হবে। তখন যা প্রার্থনা আছে তার কাছে প্রকাশ করবে। তার সাধনমন্ত্র এই :

"মালকাতুণী বন্দর সন্দরোভৈরবী ও কনামাস যজাভৈরবী কালফারদিন নম ফট স্বাহা"।[৩৬]

দ্বিতীয় অশরীরী জীব হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের বিশ্বস্ত প্রতিভূ নাম "বত্রি" (?)[৩৭]; লোহিত-বর্ণা, অপূর্ব সুন্দরী ভয়ঙ্করী, যুগলসিংহবাহিনী, একহাতে ধনুর্বাণ, অন্য হাতে অসি। তার সাধনমন্ত্র প্রতিদিন চার হাজার বার পড়তে হবে; চতুর্দশ দিবসে সে আবির্ভূত হবে; আর তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করবে। তার কাছে কাম্য হচ্ছে শত্রুদমন, যুদ্ধজয়, উপদ্রব-কারীর মৃত্যু ও অত্যাচার রোধ। তার মন্ত্র হচ্ছে :

"হোং ত্রিবাদেবী (ত্রিপুরাদেবী?) ভস্করমারী ভুসঙ্ক সক্কীহাবি দেবা দেবতাতারি হোং ত্রিবা (ত্রিপুরা?) দেবী ভস্করমারী নম নম ফট স্বাহা"।

তৃতীয়, বৃহস্পতি গ্রহের বিশ্বস্ত প্রতিভূ, নাম 'মঙ্গলা': পীতাভ রক্তবর্ণা অনিন্দ্য-সুন্দরী, পুজার আসনে উপবিষ্ট। তার কাছে বিবাদের শান্তি, খ্যাতি, তপস্যা ও ঈশ্বরারাধনার শক্তি, কেবল এই সব কাম্য। সে ঔষধি ও আশুফলপ্রদ বিনাশক শিকড়াদির রক্ষয়িত্রী। তাকে তুমি ভয় কোরো, ভয় না করলে তোমার ক্ষতি হবে। তার সাধন-মন্ত্র প্রতিদিন পাঁচহাজার বার পাঠ করবে; একাদশ দিবসে তার আবির্ভাব হবে। মন্ত্র এই :

"ওং হ্রীং কুলকলাদেব ইন্দুমুখ নম নম ফট স্বাহা, ভবানী ক্ষিরঙ্গবানি হুং হ্রীং"।

চতুর্থ, সূর্যের বিশ্বস্ত প্রতিভূ, নাম (বেদমাতা?) 'পদ্মা'; রক্তাভ, পীতবর্ণা, হংসাসীনা, স্বরূপা, তার কাছে শৃঙ্খলা, রাজত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রার্থনা করতে হয়; অতি স্নেহশীলা, তুমি তাকে সম্মান ও সমীহ করবে, তার আবির্ভাব হলে তার সেবার জন্য তুমি উঠে দাঁড়াবে। প্রতিদিন চার হাজার বার তার সাধনমন্ত্র পাঠ করতে হবে, বিংশতি-দিবসে সে দর্শন দেবে। সে জননীর ন্যায় স্নেহময়ী। তার মন্ত্র এই :

"নৃং ব্রীং ওং স্ত্রীং হুং পদ্মাদেবী নম নম ফট স্বাহা।"

পঞ্চম, শুক্রগ্রহের বিশ্বস্ত প্রতিভু, নাম 'সরস্বতী'। হরিতাভ গৌরবর্ণা, অপূর্ব সুন্দরী, প্রফুল্লমুখী, ময়ূরাসীনা, হাতে মুকুর। তার কাছে সুষমা ও সৌকর্য ছাড়া আর

কিছু কাম্য নয়। তার হাতে বিদ্যাবুদ্ধি কাব্য সঙ্গীত ও চারুকলা আছে। তার আবির্ভাবে তুমি তার সাথে সহজ ব্যবহার করবে, হাস্য করবে, আড়ষ্ট হয়ে থেকো না, নইলে তোমার ক্ষতি হবে। তার মন্ত্র এই :

"ওং ওং সরস্বতী দেবী ওং নম নম ফট স্বাহা।"

ষষ্ঠ, বুধগ্রহের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। নাম 'তারা' লালিমামিশ্রিত গৌরবর্ণা অপরূপ সুন্দরী, হাতে একটি পুঁথি যা সে সর্বদা পড়ছে, কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না; তার কাছে জ্যোতিষবিদ্যা ও সহজ লিখনক্ষমতা প্রার্থনা করতে হয়। বরদানে সে বিলম্ব করে। প্রতিদিন ছয় হাজার বার তার সাধনমন্ত্র পাঠ করলে পঞ্চবিংশতি দিবসে সে দেখা দেবে। তার ধ্যানমন্ত্র এই :

"ওং, যং নারী নবতিলা দেবী এষণাতি দেশ দেশ ত্রাণি মোক্ষ ভূত প্রেত ত্রারিণী ওং হোং তারা দেবী ওং নম নম ফট স্বাহা।"

সপ্তম চন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ, নাম "তোতিলা"। গৌরবর্ণা, সুন্দরী। এরই অধীনে দশটি আধ্যাত্মিক বা অশরীরী জীব আছে। এর মস্তক একটি; কিন্তু দেহ সাতটি; একটি দেহ শ্বেতবর্ণ, একটি রক্তাভ শ্বেত, একটি হরিতাভ শ্বেত, একটি পীতাভ ও রক্তাভ শ্বেত, পঞ্চম দেহ লোহিত, ষষ্ঠ কৃষ্ণ। সে সহজে বর দেয় না। তার সাধনমন্ত্র প্রতিদিন সাত হাজার বার পাঠ করতে হবে, তাহলে ৪৭তম দিবসে সে দেখা দিয়ে তোমাকে বর দেবে। তার মন্ত্র এই :

"ওং তোং অবন্তারী দেশ দেশ ত্রাণি রাক্ষস ভূত প্রেত তারিণী ওং যং অধ-আদি ওং নম নম স্বাহা হুএনা তোতিলা দেবী নম নম স্বাহা।"

"যে সব সাধন মন্ত্রের কিছু কিছু আমি উল্লেখ করলাম সেগুলিকে 'হোম' বলা হয়। এগুলি প্রার্থনাও জপের মত সব সময়ে বা প্রাত্যহিক কাজ করতে করতেও পড়া যায়।" ৩৮

যে মূল অমৃত-কুণ্ড হিন্দ্ভী ভাষায় দশ অধ্যায়ে ও পঞ্চাশটি পদ্যে রচিত ছিল বলে ভূমিকায় বলা হয়েছে তা "ভোজর ব্রাহ্মণের" নিজস্ব রচনা কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তার যে explanatary paraphrase অম্বুয়ানাথ করেছিলেন এবং যা ভূমিকা-লেখক নিজভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন তাও যে অবিকৃত ও সম্পূর্ণভাবে এই পুথিতে নকল করা হয়েছে তাও বলা শক্ত। লিপিকার যে নিজ জ্ঞান ও রুচিমত বা পাঠোদ্ধারে অপারগতা-বশতঃ কিছু কিছু পাঠ বা সংযোজনা বা টীকা জুড়ে দিতেন সে মধ্যযুগীয় অভ্যাসের লক্ষণ এখানেও বর্তমান; তৃতীয় ভূমিকাটিই তার প্রমাণ। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ লিপিকারের হস্তলিপিতে মন্ত্রের উচ্চারণ ও ধারণীর চিত্রগুলি যে অবিকৃত থাকবে তাও আশা করা যায় না। তা ছাড়া, ভূমিকা-লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর কাছে যে সব কথা বা ভাব দুর্বোধ্য ঠেকেছে তা তিনি বাদ দিয়েছেন।

ভোজর নামটিও মনে হয় কোনও সংস্কৃত শব্দ বা নামের বিকৃত রূপ। আসল শব্দটি

কি 'বজ্র' হওয়া সম্ভবনীয়? মহাযানী তান্ত্রিক সাধকরা তো দীক্ষার সময়ে এই ধরণের নাম গ্রহণ করতেন, যেমন কুমারবজ্র, জ্ঞানবজ্র, লাবণ্যবজ্র, অন্বয়বজ্র ইত্যাদি?[৩৯]

বিকৃতি সত্বেও এই আরবী ফারসী বিষয়বস্তু থেকে মনে হয় যে মূল পুস্তকটি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রের মিশ্রিত কায়ামন্ত্রসাধন ও যোগপদ্ধতির একটি পুস্তিকা (handbook) জাতীয় রচনা ছিল, যা 'ভোজর ব্রাহ্মণ' নিজে হয় সঙ্কলন নয়তো অনুলেখন করে থাকবেন। সপ্ত দেবী (মাতৃকা?) ও তাদের চৌষট্টি অনুচরী যোগিনীর যেমন উল্লেখ আছে তেমনই কালিকা, সরস্বতী-বেদমাতা (বা পদ্মা) প্রমুখ দেবীদের নামের সঙ্গে তারা, মঙ্গলা, (কুরুকুল্লা?) প্রমুখ বৌদ্ধ আয়তনের দেবীদেরও নাম আছে[৪০]। কিন্তু এই সপ্তদেবীর সঙ্গে সপ্তগ্রহের যে সম্পর্কে কল্পিত হয়েছে তা তন্ত্রের কোন্ শাখার ও কোন্ অধ্যায়ের? কৌলশাস্ত্রের যে প্রাচীন রূপ কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে বিবৃত, তাতে সে সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায় কি? তা ছাড়া, দেবীদের যে ধ্যানমূর্তির বর্ণনা আরবী অমৃত-কুণ্ডে পাচ্ছি, তা তন্ত্রসাধনের কোন্ শাস্ত্রানুযায়ী?

তাই নয় শুধু; নাথপন্থী সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে 'গোরক' (গোরক্ষ) ও মীন (নাথের) নামও প্রথমোক্ত মন্ত্রে পাচ্ছি। পঞ্চম অধ্যায়ের থেকে উদ্ধৃত এই অংশে গোরক্ষ, মীননাথ চৌরশি (বা চৌরঙ্গি) সিদ্ধাদের ইঙ্গিতও আছে মনে হয়:

"প্রাণায়াম সাধনার সিদ্ধ হলে তিনটি বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও মর্মোপলব্ধিতে অন্তর্দৃষ্টি জন্মাবে; এক, মাতৃগর্ভে শিশু কেমন করে বাস করে ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়; দুই, মৎস্য কেমন করে জলের মধ্যে শ্বাস গ্রহণ করে অথচ জল তার নাসিকায় প্রবেশ করে না; তিন, শিকড় দ্বারা বৃক্ষ কেমন করে ঊর্ধ্বে পত্রপল্লবে সে রস সঞ্চারিত করে।

"শিশু হচ্ছে গুরু (গোরক্ষ), অর্থাৎ খিজির; মৎস্য হচ্ছে মীননাথ অর্থাৎ জুন্নুন, আর বৃক্ষ হচ্ছে চৌরশি (চৌরঙ্গি?), অর্থাৎ ইলিয়াস যারা সবাই আর-ই-হায়াত;" অর্থাৎ জীবন সলিলের সন্ধান পেয়েছিলেন।[৪১]

প্রথম অনুচ্ছেদের কথাগুলি মূল শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ গোরক্ষ-বিজয়ের বা চর্যাপদের সন্ধা ভাষায় তত্ত্বজিজ্ঞাসার মত, আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের কথাগুলি তার অভুয়ানাথ কৃত ব্যাখ্যা, মুসলমান mythologyর সাথে সমীকরণ করে মুসলমান পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য করার চেষ্টা।[৪২]

মৎস্যকে মীননাথ বলে কি মৎস্যরূপী মীনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় নি যিনি ক্ষীর সাগরে তত্ত্বালোচনারত হরগৌরীর কথোপকথন গোপনে শুনেছিলেন?[৪৩]

উপরি-উক্ত সপ্তম বীজমন্ত্রের 'হংসেশ্ব' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'হে সঞ্জীবক'। যোগিনীতন্ত্রে হংসকে দেহমধ্যস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি ও সৃষ্টি ও সংহার কর্তা শিব বলা হয়েছে।[৪৪] এই সাদৃশ্যটুকু অনুধাবনযোগ্য মনে হয়।

নির্দেশপঞ্জী

১. Ethe : *Catalogue of Persian Manuscripts in the India Office Library*, no 2002 ; Library of Pir Muhammud Shah of Ahmedabad, no 223 ; *Islamic Culture*, April 1947, pp. 190-191 ; *Journal of Pakistan Historical Society ;* 1953, pp. 54 55.

২. Faizal Karim Press, Madras. 1310 A.H.

৩. শব্দটি নিঃসন্দেহ নয় ; ফারসী অক্ষরে এইরূপ আছে।

৪. *Islamic Culture* : প্রাগুক্ত।

৫. তবকাত্-ই-নাসিরি, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রকাশিত, পৃ. ১৫৯ ৬০ ; হবিবুল্লাহ্, *Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad, 1961, পৃ. ৯০-৯১, ৯৭-৯৮।

৬. হাজী খলিফা, কাশ্ফুজ্-জুনুন্, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪

৭. নিজামুদ্দিন বখ্শী, তবকাত-ই-আকবরী, B. Do অনূদিত, পৃঃ ৭০০ ; আবুলফজল—আইন-ই-আকবরী Blochmann অনূদিত ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৯ ; গওস গওয়ালিয়রী ও তাঁর ভ্রাতা শেখ বহলোলের প্রতি আবুলফজল অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন, তাঁদের সাধুতায় সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি নানা কটূক্তি করেছেন ; আকবর নামা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫ ; মাআসিরুল-উমারা, ২য় ৫৭৮। মুহম্মদ ইকরাম—রওদ-ই-কওসর, করাচী, পৃ. ২২-২৫ ;

৮. ঐ ; আবদুল হক ; আখবারুল-আখিয়ার (মুজতবায়ী প্রেস, দিল্লী, ১৩০৯ হিজরী) পৃ. ১৭১ ; *Medieval India Quarterly*, October 1950, p. 57, note 3.

৯. আবদুল কাদের বদায়ূনী, মুন্তাখাবুত-তওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪-৫, ৩৪-৩৫ ; *Medieval India Quarterly*, October, 1950, পৃ. ৫৯ ; রওদ-ই-কওসর, পৃ. ২৫ ; Ivanon , *Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Asiatic Society of Bengal*, pp. 96-108, no. 240.

১০. Shustary : *Outlines of Islamic Culture* ; ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭ ; *Encyclopeadia of Islams* , Shattariya নিবন্ধ দ্রষ্টব্য ; Herklots : *Islam in India*, পৃ. ২৮৯ ; মা'আরিজুল্-বিলায়াত উদ্ধৃত *Mediaval India Quarterly.* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭ নোট ৩ আখবারুল-আখিয়ার, ঐ পৃ ১৭১।

১১. মুহম্মদ ইকরাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫ ; Titus ! *Indian Islam*, পৃ. ১২৩ ; বদায়ূনী ; ঐ, পৃ. ৪ ৫ ; মুতামাদ খান : ইকবাল-নামা-ই জাহাঙ্গিরি, পৃ. ১৪৯ ; খলিক আহ্মদ নিজামী : *Shattari Saints and their attitude towards the State—Medieval India Quarterly.* Vol. I. no. 2,1950.:56-70.

প্রবন্ধ লেখক 'বাহ্রুল-হায়াত'কে গওস গওয়ালিয়রীর নিজস্ব রচনা বলে উল্লেখ করেছেন, মুহম্মদ ইকরামও তাই করেছেন। এ সংবাদ ঠিক নয়।

১২. *Bibliotheque Nationale Paris*, আরবী হস্তলিপি নং ৭৭৩, ও ১৬৯৯ ; Leyden, Or. নং ৭২৩ (৩) *Catalogue Codicium Orientalum,* III. p. 164 : *Goth Catalogue.* নং ১২৬৫, ১২৬৬।

১৩. ৩নং টীকার উল্লিখিত ফারসী সংস্করণের পাঠের সঙ্গে তুলনীয় ; আসল বাক্য কি 'ব্রাহ্মণ উপনিষদ্' ছিল, যাকে লিপিকার দুইভাবে পাঠ করেছেন, এবং অপরিচিত শব্দের সঙ্গে আরবী শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্য ধরে তার এক মনগড়া ব্যাখ্যা পাঠের মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন ?

১৪. Leyden পুঁথিমালার Or. 723 (3) নং পুঁথির ২৯-৪৭ক পত্রাঙ্ক থেকে উদ্ধৃত।

১৫. Arberry, J. A. : Sufism. *Encylopeadia df Islam.* p. 97, ইবনুল আরবী নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৬. Brockelmann : *Geschichte den Arabischen Litte atur*, I. pp. 437-40, 441-46,

১৭. সুলেমান নাদভী : "আরব ও হিন্দ কে তা'অল্লকাত্," এলাহবাদ হিন্দুস্থানি একাডেমি.১৯৩০

১৮. Arberry : পৃ. ৯৮-১০১ ; Nicholson. R. A, *Studies in Islamic Mysticism.* পৃ. ১২০-১৪২ ;

১৯. *Encyclopeadia of Islam* ; *'Abu Yazid (Bayazid) al Bistami'* দ্রষ্টব্য। মুসলিম সুফিবাদে Pantheism এর প্রকাশ Zulunn Miseri (মৃত্যু ৮৬১ খ্রী.) থেকে দেখা যায় ; এমনকি, তাঁরও পূর্বে, অল্‌মহাসিবির (মৃত্যু ৮৩৭ খ্রী.) রচনাতেও অদ্বৈতবাদের দৃষ্টান্ত বিরল নয় ; Arberry পৃ. ৪৬-৫৩ ; জুনায়দ বাগ্দাদী (মৃত্যু ৯১০ খ্রী.) ও মনসুর হাল্লাজ (মৃত্যু ৯২২) ও এই মতের সাধক ছিলেন।

২০. ইবনুল আরবী : ফসুসুল-হিকম্ Cairo. পৃ. ৭০-৭৮ ; Affifi. A. E : *The Mystical Philosophy of Ibrial Arabi* ; 'Legacy of Islam', পৃ. ২২৪-২২৬ ; মির্জা মুহাসিন ফানি : দবিস্তানুল-মজাহিব, বোম্বাই, পৃ. ৩০৪-৩০৮।

Shustary : *Outlines of Islamic Culture,* II, পৃ. ৫০৭।

২১. Blochet : *Mussalman Painting.* pl. II.

২২. *Journal of American Oriental Society.* VIII. pp. 99-100.

২৩. Arnold. I-W : *Catalogue of Mughal Miniatures in the library of Chester Beatty.* London. I. pp. 80-82 ; III, Plate 98.

২৪. দবিস্তানুল-মজাহিব, (বোম্বাই), পৃ. ১৪৪।

২৫. *Bibliotheque Nationale in Roman,* ৭৭৩ সংখ্যক আরবী পুঁথি, এবং Gotha Collection এর ১২৬৬ সংখ্যক পুঁথি।

২৬. Arborry, A. J., *Sufism.* পৃ. ৬৮

২৭. Nicholson, R. A. : *Literary History of the Arabs.* পৃ. ৪৬২-৩।

২৮. Yusuf Husain : *La Version de l' Amratkund : Journal Asiatique.* CCXIII. 1928, পৃ. ৩১২-৪৪।

২৯. কোরান : ৭-১৬৬-৭। সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রত্যেক মানুষের আত্মাকে আল্লাহ্ প্রশ্ন করলেন—"আমরা কি তোমাদের প্রভু নই ?" সকলেই উত্তর দিল, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের প্রভু। মরমীয়া সুফীবাদে আল্লাহ্ ও মানুষের যে সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে তাতে কোরানের এই সূত্রে উল্লিখিত মানব-আত্মার এই অঙ্গীকারকে তার মৌলিক অবস্থার ইঙ্গিত বলে ধরা হয়েছে যখন সে পরমাত্মার মধ্যে নিহিত ছিল ; অঙ্গীকার পালনের অর্থ তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ পরমাত্মায় বিলীন হয়ে অবস্থান করা, সুফীদের ভাষায় যার নাম বকা-বিল্লাহ্ ; তার পূর্বাবস্থা হচ্ছে অহংজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান লোপ, বা ফনা-ফিল্লহ্। সুফীতত্ত্বের এই মূল সূত্রের সর্বপ্রথম যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা জুনায়দ বাগ্দাদী (মৃত্যু ৯১০ খ্রীঃ) এই ভাবে করেছেন : "আল্লাহ্‌র মধ্যে নিহিত অবস্থা ছাড়া যখন তাদের অন্য অস্তিত্ব ছিল না, আদম-সন্তানদিগকে তখন আল্লাহ্ এই কথাগুলি বলেছিলেন। তাদের সে অস্তিত্ব সৃষ্টি জীবদের সাধারণ অস্তিত্ব নয় ; এ এমন অস্তিত্ব যার জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে, একমাত্র তিনিই যার সম্বন্ধে সচেতন। তাদের অনস্তিত্বের কালে তিনি তাদের জানতেন। তাঁর জ্ঞান তাদের সূচনাকে বেষ্টন করে ছিল। যখন নিজেদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের চেতনাও তাদের ছিলনা, তাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব তখন আল্লাহ্‌র চেতনায় লীন ছিল। এই আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের অর্থ হল আল্লাহ সম্বন্ধে তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা নয়।" Massignon : *Essai Sur l. origin musalmane,* Paris. 1922, পৃ. ২৭৩-৪ ; *Journal of the Royal Asiatic Society,* 1935, পৃ. ৫৯৯।

পূর্বাবস্থা প্রাপ্তির এই প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা-ই জুনায়াদের মতে মানবাত্মার আসল বৃত্তান্ত। পরবর্তী যুগে এই প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা সুফীসাহিত্যে প্রেমে পরিণত হয়; জালালুদ্দিন রুমীর সুবিখ্যাত মসনবীর প্রথম কবিতায় যার আভাস সুস্পষ্ট:

Hark how the reed with shril sad strain
Of lover's parting doth complain.
From the reed bed since I was born
My song makes men and women worn
Loves pain and passion to impart.
Want a sympathising heart.
He pines, the wretch who far must roam.
For his old happiness and home.

—R. A. Nicholson-এর অনুবাদ।

প্রস্তাবনা অধ্যায়ে মরমীয়া সুফীবাদের এই সূত্রের সঙ্গে পুস্তকে বর্ণিত আত্মার পরিক্রমণতত্ত্বের সামঞ্জস্যপ্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। ভোজর ব্রাহ্মণের মূল রচনাতে কোরানের এই বাণীর উল্লেখ বা তাকে মূলসূত্র অবলম্বন করে আত্মার যাত্রারম্ভের এই বর্ণনা ছিল মনে করা শক্ত। এই সমীকরণটুকু খুব সম্ভব অনুয়ানাথ কিংবা ইবনুল আরবীর নিজের।

৩০. এই ভাবের অবিকল পুনরুক্তি দেখা যায় ফরিদুদ্দিন আত্তারের (মৃত্যু ১২৩০ খ্রী.) 'মুনতিকুত-তায়র' নামক রূপক কাব্যে। E. G. Browne, *Literary History of Persia*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২-১৫।

৩১. *Journal Asiatique*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-১৬।

৩২. এখানে যে নকশাটি থাকার কথা তা লিপিকার নকল করেন নি।

৩৩. এখানে একটি শব্দ পড়ে গেছে।

৩৪. চতুর্থ অধ্যায়ে পাঁচটি যোগের আসনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; প্রথম বর্ণনাটি পদ্মাসনের।

৩৫. *Journal Asiatique*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯-৩৪।

৩৬. শব্দগুলির বাঙলা অক্ষরে এই প্রতিলিখন নিঃসন্দেহ নয়; সংস্কৃত জানা থাকলে হয়ত ধ্বনির সমতা ও অর্থ ধরে আসল শব্দগুলি উদ্ধার করা যেত।

৩৭. ত্রিপুরের বিকৃতি কি? 'ত্রিপুর সুন্দরী' তো তন্ত্রশাস্ত্রে কামকলার; আর এক নাম; দ্রষ্টব্য: P. C. Bagchi, *Kaulajnananirnaya*, p. 45.

৩৮. *Journal Asiatique*; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

৩৯. নীহাররঞ্জন রায়; বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব; পৃ. ৬৪০, ৭১৬. ৭১৮।

৪০. ঐ পৃ. ৬৪১, ৬৭০।

৪১. *Journal Asiatique*, ঐ পৃ. ৩২৬-২৭।

৪২. আবদুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষ বিজয়ের এই পদগুলির সঙ্গে তুলনীয়:

তৃতীয় বিংশেতে ছিলা জননী উদরে
কোন দেব আছিলেক তোমার শরীরে॥—পৃ. ১৯১।

মূল অমৃত-কুণ্ডের সঙ্গে তার ফারসী তর্জমার প্রভেদ নিয়ে মির্জা মুহসিন ফানির যে মন্তব্য উপরে উদ্ধৃত করেছি, তা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ফারসী তর্জমায় গোরক্ষনাথকে খিজির আর মৎস্যেন্দ্রকে ইউনুস বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে বলে তিনি বলেছেন। আরবী তর্জমাতেও যে তা ছিল তা বোধকরি তিনি

জানতেন না। আরবীতে গোরক্ষের স্থলে যা লেখা আছে তার অর্থ গুরু। শব্দটির নাম-তাৎপর্য জানা না থাকলে তাকে সাধারণ গুরু শব্দ পড়াই স্বাভাবিক।

Muslim mythologyতে খিজির হচ্ছেন পয়গম্বর বিশেষ যাঁকে কোরাণে হজরত মুসা সম্পাকত এক কাহিনীর কেবল 'যুবক' শব্দে বিশেষিত এক অনামিত ব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। মানুষের উপকারার্থে তিনি অশরীরী অবস্থায় পৃথিবীতে বিরাজ করেন। সাধারণতঃ বিশেষ করে ভারতবর্ষে তাকে জলযাত্রীদের সাহায্যকারী পীর পয়গম্বর মনে করা হয়। 'খিজির' শব্দ আসলে Al-khazir-এর কথ্য রূপ। যার অর্থ সবুজ, অর্থাৎ চিরতরুণ।

'ধুন নুন' ইউনুস পয়গম্বরের আর এক নাম যা কোরানে (২১'৮৭) ব্যবহার করা হয়েছে। একবার তিনি নৌকাযাত্রাকালে জলে নিক্ষিপ্ত হয়ে এক তিমি মাছের উদরে প্রবেশ করেন; সেখানে তিনি আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হন নি। এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া ত্যাগ করেন নি। কয়েকদিন পরে তিমি মাছ তাকে উদ্গীরণ করে তীরে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সেখানে তাকে রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করার জন্য একটি বৃক্ষ জন্মে এবং ফেরেস্তা এসে তাঁকে বস্ত্রাবৃত করে। পরে তিনি পয়গম্বরি প্রাপ্ত হন।

'ইলিয়াস' কোরানে উল্লিখিত আর-এক পয়গম্বর যাঁকে তার প্রার্থনামত আল্লাহ্‌ তাঁর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জীবন্ত অবস্থায় মানবাকৃতি পরিবর্তন করে অশরীরীরূপে মানবসমাজের উর্ধ্বে তুলে নিয়েছিলেন। অমর হয়ে তিনি মানুষ ও ফেরেস্তার মধ্যবর্তী স্তরে বিরাজ করছেন। কারও কারও মতে, তিনিই আসলে খিজির পয়গম্বরের আদিরূপ। সাধারণ মতে, তিনিও খিজির আব-ই-হায়াত, অর্থাৎ জীবন-সলিল পান করে অমরত্ব লাভ করেছেন। *Encyclopedia of Islam*-এর 'Yunas Al-khazir' ও 'Ilyas' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৩. প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃ. ১০।

৪৪. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, কৌলজ্ঞাননির্ণয়, সপ্তম পটল।

রবীন্দ্রশব্দের গঠনবৈচিত্র্য

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

পুরানো শব্দে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন মেটে নি। কোনো লেখকেরই মেটে না। রবীন্দ্রনাথের তো নয়ই। তবু মনে হয় প্রথম দিকে তিনি খুব কম শব্দই রচনা করেছেন। পুরোনো শব্দই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অর্থব্যঞ্জনায় নব নব রূপে প্রকাশ করেছেন। শব্দ বানানোর ঝোঁক বেড়ে চলেছে বয়সের সঙ্গে। নতুন যুগের নতুন চিন্তাভাবনা কবির মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর দশজনের মতো তাঁকেও যুগোপযোগী শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। বাক্‌বন্ধ, শব্দ সবই যুগপ্রভাবে প্রভাবিত। প্রথম দিকে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে বা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' যেখানে ইংরেজী শব্দের বা বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে তা ছাড়া অন্যত্র ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। অন্যত্র না গিয়ে সাহিত্য আলোচনার কথাই ধরা যাক। 'প্রাচীন সাহিত্যে' শেক্সপীয়রের টেম্পেস্টের সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা প্রসঙ্গে তিনি কটা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করেছেন। আসলে এই-সব ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ স্বীকরণই লক্ষণীয়। তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবকে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। তিনি যে স্রষ্টা, শিল্পী। আর দশজনের ছেঁদো কথা, বাঁধাবুলি নিয়েই কারবার। তাঁর কারবার নতুন কথার সৃষ্টি নিয়ে।

শেষের দিকে যখন তিনি তাঁর সাহিত্য-চিন্তার কৈফিয়ৎ দিতে মাঝে মাঝে উদ্দীপ্ত হয়েছেন, তখনই বহু ইংরেজী শব্দের সরাসরি ব্যবহার বা বাংলা করে ব্যবহার করেছেন। শুধু সাহিত্য আলোচনায় নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি ইংরেজীর বাংলা প্রতিশব্দ— অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যজগতের এবং বাস্তবজগতের পরিবর্তনের হাওয়া তাঁরও লেগেছিল।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নতুন শব্দ বানানো ছাড়াও বিশেষ্য-বিশেষণ প্রয়োগে, কোথাও-বা কৌতুক সৃষ্টি ও মিলের জন্য শব্দের রূপের রদবদল করেছেন। কৌতুকবশে দু-একটি শব্দ বানিয়েছেনও। আনুকৌলব (অনুকূলের ছেলে), মাংপবী (মংপুবাসিনী), মাশবী (মশা বিষয়িণী), কোথাও-বা নতুন নতুন সমাস বানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই-সব শব্দসৃষ্টির বৈচিত্র্যের বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

নতুন শব্দ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রত্যয় ছাড়াও সংস্কৃত প্রত্যয় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। শুধু তৎসম শব্দেই নয়, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী সকল শব্দেই সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত করেছেন। এইভাবে শব্দগঠনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ব্যাকরণের বিধি লঙ্ঘন করেছেন। বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত দৈন্যই হয়তো তার

কারণ।[১] কবির প্রয়োগ থেকে কিছু বিশিষ্ট ও নতুন শব্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কিছু পুরানো শব্দও এই তালিকায় আছে। এই-সব শব্দ কবির শব্দসৃষ্টির প্রবণতার প্রকৃতিনির্দেশ করছে।

পণ্ডিতজনের বিচারের জন্য আমার এই সংগ্রহ।

অ। আনুকৌলব, আনুযাত্রিক, আন্তর্ভৌম, ঐকতান, ঐশিয়, চৌম্বক, দ্বৈরাজ, নৈরাজ, নৈরাশ, নৈরাশ্য, পৈষ্টকী, পৌরোহিত (শক্তি), বৈদ্যুত, বৈমুখভাব, বৈলাতী, মাধব (মধুজাত), মাংসবী, মাশবী, মৌশল, স্নায়ব। কোথাও কোথাও electricityর প্রতিশব্দ রূপে বৈদ্যুত শব্দটি বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

অক, ইক, ক। অনামক, অবসাদক, অভ্রবিদারক, আগামিক, উৎপাতক, উপদেশক, কর্তৃভাবক, কার্যহস্তারক, চিত্তাকর্ষক, চোখধাঁধক, তন্দ্রাকর্ষক, নেতিভাবক, পঙ্‌ক্তি-লঙ্ঘক, প্রতিবাদক, প্রোৎসাহক, বস্তাবাহক, লিখক, সমবেদক, স্তুতিবাদক; অতলান্তিক, অত্যুৎসাহিক, অনুষায়িক, অভাষিক, অভ্রান্তিক, অমানবিক, আঙ্কিক, আঙ্গারিক, আজ্ঞেয়িক, আণুবীক্ষণিক, আত্মজৈবনিক, আত্মিক, আধিকর্মিক, আন্তর্দৈপিক, আবধৌতিক, আবশ্যিক, আভিজাতিক, আয়ুর্বৈদিক, উদ্‌ভ্রান্তিক, একমাত্রিক, একান্নপারিবারিক, ঐকতানিক, ঐকত্রিক, ঐকমাত্রিক, ঐকরাষ্ট্রিক, ঐকহাস্তিক, ঐথরিক, ঔপদেশিক, ঔপনাগরিক, ঔপায়িক, কন্যাদায়িক, কর্মিক, কাব্যিক, কিশোরক, কৈশিক, খাদ্দরিক, খেলনক, গাণিতিক, গীতিকাব্যিক, গৃহনৈতিক, ছান্দসিক, জর্মনিক, জাগতিক, জাঠরিক, জানপদিক, জৈবিক, তাৎক্ষণিক, ত্রৈমাসিক, দায়িক, দেশিক, দৈবিক, দৈশিক, দৌতিক (যম-), ধর্ম-সামাজিক, ধর্মনীতিক, ধর্মনৈতিক, নাট্যিক, নৈঃসঙ্গিক, নৈর্ব্যক্তিক, নৈহারিকতা, ন্যূনাংশিক, পাঞ্চভৌতিক, পাশবিকতা, পাশ্চাত্যিকতা, পৈতামহিক, প্রপৈত্রিক, প্রাক্‌গাল্পিক, প্রাক্‌ভূতাত্ত্বিক, প্রাত্তিক, প্রান্তিক, বহুমাত্রিক, বহুলাঙ্গিক, বাতায়নিক, বাহুহাস্তিক, বিরলাঙ্গিক, বিশ্বজাগতিক, বিশ্বভৌতিক, বিশ্বভৌমিক, বৃহদাংশিক, বেতারবার্তিক, বৈকালিকী, বৈনাশিক, বৈয়ক্তিক, বৈলাতিক, বৈশ্বমানবিক, বৌদ্ধিক, ব্যবহার-নৈতিক, ব্রাহ্মিক, ভাবিক, মরণান্তিক, মহাজাতিক, মাধ্যমিক, মানবিক, পরমমানবিক, মাহাদেশিক, যান্ত্রিক, যৌগিক, রবিবারিক, রবিবাসরিক, রাঘুবংশিক, রাষ্ট্রিক, রূঢ়িক, শাব্দিক, শাস্ত্রিক, শাহরিক, শৈল্পিক, শ্বাশুরিক, ষাণ্মাত্রিক, সমমাত্রিক, সভ্যনামিক, সমাজনৈতিক, সাংখ্যিক, সাংগীতিক, সাম্বাৎসরিক, সাম্রাজ্যিক, সার্বজাতিক, সার্বত্রিক, সার্বভৌমিক, স্বদৈহিক, স্বসাম্প্রদায়িক, স্বাতন্ত্রিক, স্বাদেশিক, স্বারাজিক, স্বৈচ্ছিক; অঞ্জলিকা (কুসুমাঞ্জলিকা), অবন্তিকা, ঐকান্তিক, কবিতিকা, কমলিকা, করবিকা, কিরীটিকা, কিশোরিকা, খনিক, গন্ধিকা,

---

১. "বাংলা ভাষার আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য।"— র-র ২৬।৪২১ পৃ. "বাংলা ভাষাতেও প্রত্যয় আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ সংকীর্ণ।"— র-র ২৬।৪২৩ পৃ.।

গ্রহিকা, চণ্ডালিকা, চতুরিকা, চয়নিকা, জাতিক, তরুকা, থালিকা, দাম্ভিকা, দীপালিকা, নিকণিকা, নিপুণিকা, পত্রালিকা, পরিপ্রেক্ষণিকা, প্রজাপতিক, প্রাণিক, বরযাত্রিক, বল্লিকা, বেণুকা, ব্যজনিকা, মধ্যমিকা, মালতিকা, মুকুলিকা, ললিতিকা, লহরিকা, স্বজাতিক, স্বাজাতিক, হেমন্তিকা।

অন। অন্তরায়ণ, ঝনন, ঝরন, ধাঁদন, পড়ন, ভরন (তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ/ করি প্রলয় শ্বাস ভরণ।), মোছন, রূপায়ণ।

আনা। ক্লাসিকিয়ানা, গরিবিআনা, দিদিয়ানা, নায়কিআনা, বড়োমানুষিয়ানা, লেখকিআনা, শরিকিয়ানা, সেকেলিয়ানা।

ইত। অন্তরায়িত[২], কুণ্ডলায়িত, তরঙ্গায়িত, বহুশাখায়িত, মেঘায়িত, রূপায়িত, আহরিত, উদ্‌গিরিত, খনিত, নিঃশ্বাসিত, পরাশিত, বিকিরিত, মেঘক্রীড়িত (নভোমণ্ডল), সৃজিত, সমাপিত; অবন্ধিত, অলসিত, কলকলিত, কলকল্লোলিত, কল্লোলিত, কুণ্ডলিত, খণ্ডিত, গঞ্জিত, গীতকলিতা, চঞ্চলিত, তরঙ্গিত, নির্ঝরিত, পিঞ্জরিত, পুনঃপুনিত, পূর্ণিত, ভিন্নিত, ভ্রূভঙ্গিত, মঞ্জরিত, মন্দ্রিত, রসিত, লণ্ডিত-ভণ্ডিত, লম্ফিত, লোভিত, শিথিলিত, শিল্পিত, শিশিরিত, সংকল্পিত, স্বাক্ষরিত, হিল্লোলিত।

ইন্, ঈন। অন্যায়ী, কৃষী, নির্ভরী (শ্বশুরনির্ভরী), পন্থী, বঙ্গশাখী, রূঢ়ী, সংবাদী, স্বদেশী, স্বধর্মী, স্বরাজী; অনপায়ী, অল্পাশী, অশঙ্কিনী, আত্মদাহী, আত্মবিসর্জী, উপনিবেশী, ক্ষণজীবী, গন্ধজীবী, চিত্রী, ছুটি-সম্ভোগী, জগৎবিনাশী, দিগন্তরোধী, দ্রাক্ষাপায়ী, প্রতিমুখী, প্রভাতকিরণপায়ী, প্রশ্নকারিণী, বক্ষোবিদারী, বন্ধননাশী, বহুসংগ্রহী, বিলোপী, ভিন্নভাষী, ভূরিপায়ী, মধুসন্ধায়ী, মনোজয়ী, মহাপ্লাবী, মৃত্যুজয়ী, মৃত্যুস্বীকারী, রক্তপায়ী, সন্দেহী, সহস্রবাহী, সূর্যরশ্মিপায়ী, সেবাকারিণী, স্নানকারী, স্বভাষী, সুসংস্কারী। অচিরকালীন, অনন্তকালীন, আজন্মকালীন, আসন্নকালীন, উত্তরকালীন, ক্ষণকালীন, চিরকালীন, নিত্যকালীন, পুরাকালীন, প্রাচীনকালীন, প্রাতঃকালীন, বর্তমানকালীন, বহুকালীন, বিশ্বভূমিন (বিশ্বভূমীন), মুহূর্তকালীন, যুদ্ধপরবর্তীকালীন, রচনাকালীন, সন্ধিকালীন, সমকালীন, সমতলীন, সর্বকালীন, সর্বভূমিনতা (সর্বভূমীনতা), সায়ংকালীন, স্বল্পকালীন।

ইমন্। অরুণিমা, গৌরিমা, ঘনিমা, তনিমা, তরঙ্গিমা, দীপ্তিমা, ধূসরিমা, বর্ণিমা, মলিনিমা, ম্লানিমা, রঙ্গিমা, রাঙিমা; অরুণিম, নীলিম, রক্তিম, লালিম, শ্যামলিম।

ইয়, ঈয়। অস্ট্রেলিয়, ঐশিয়, বিংশশতকিয়া; আরবীয়, উত্তরবংশীয়, কুকুরীয়, চিনীয়, নাট্যীয়, পরজাতীয়, পরদেশীয়, বিশ্বজাতীয়তা, বোহেমীয়, মধ্যভিক্টোরীয়, রাশীয়, স্পানীয়।

ঈ। তেপান্তরী, পণ্ডিতী, পুরাণী (আখ্যান), বরফী (শর্বৎ), বাংলাদেশী, ব্যাকরণী, ব্রহ্মী, যুবরাজী (সঙ্), রাজপথী।

২। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে এসব ক্ষেত্রে "শব্দকে পল্লবিত করিয়া তাহার ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়।—"ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, পৃ. ৮।

ওয়ালা। নিন্দার্থে ব্যবহৃত। অত্যুচ্চ-আদর্শওয়ালা, ইংরাজিওয়ালা, কথাওয়ালা, দেখনে-ওয়ালা, নতুনবুদ্ধিওয়ালা, নাচনওয়ালা, নামওয়ালা, পিঠওয়ালা, প্রগতিওয়ালা, বাস্তবওয়ালা, ভঙ্গিওয়ালা, যানেওয়ালা, শিক্ষাওয়ালা, সমাজওয়ালা, সাহিত্যওয়ালা, সুরওয়ালা, স্বাধীনতাওয়ালা।

গিরি। "এতে ভাণ করা, মিথ্যে অহংকার করা বোঝায়।" র-র ২৬।৪২৪পৃ.। অভিভাবকগিরি, জাদুগিরি, ডেপুটিগিরি, পতিব্রতাগিরি, পাণ্ডাগিরি, প্রচারকগিরি, বাহনগিরি, বেয়ানগিরি, বেহায়াগিরি, রাজাগিরি, সাধকগিরি, সাধুগিরি।

তঃ (তস্)। রবীন্দ্রনাথে কয়েকটি নতুন ও অল্প বা অপরিচিত তসন্ত শব্দ পাওয়া যায়।—অজ্ঞানত (১৩০১), অধিকাংশত, অলক্ষ্যত, অস্পষ্টত, আমূলত, তত্ত্বত, প্রকাশ্যতঃ (১৩১৯), বাহ্যত, সামান্যত, স্বরূপত। সাধারণত রবীন্দ্রনাথ এই-সব শব্দের শেষের বিসর্গ বর্জন করেছিলেন।

তা। অকর্তব্যতা, অকর্মণ্যতা, অকিঞ্চনতা, অকিঞ্চিৎকরতা, অকৃত্রিমতা, অগণ্যতা, অচিরপ্রাচীনতা, অচেতনতা, অজস্রতা, অতলতা, অতিবন্ধুরতা, অতিব্যগ্রতা, অতিব্যয়িতা, অতিরিক্ততা, অতিশয়তা, অত্যুক্তিপরায়ণতা, অত্যুগ্রতা, অত্যুজ্জ্বলতা, অধিনায়কতা, অধ্রুবতা, অনন্যতন্ত্রতা, অনন্যযোগিতা, অনর্থকতা, অনসম্ভবতা, অনাবশ্যকতা, অনায়সতা, অনিন্দনীয়তা, অনির্দিষ্টতা, অনির্দেশ্যতা, অনৈতিহাসিকতা, অনৈসর্গিকতা, অন্ধতা, অন্যায়পরতা, অপভ্রংশতা, অপূর্ণতা, অপ্রকাশ্যতা, অপ্রতিষ্ঠতা (ভারসাম্যের), অপ্রমত্ততা, অপ্রাপ্যতা, অপ্রিয়তা, অবজ্ঞাপরতা, অবশ্যবাধ্যতা, অবশ্য-রূঢ়তা, অবাধ্যতা, অভিমুখতা, অভিমুখিতা, অভ্যাসপরতা, অভ্রান্তিকতা, অমত্ততা, অমনোযোগিতা, অমলতা, অমানুষতা, অমূলকতা, অমূল্যতা, অমোঘতা, অরসিকতা, অর্থগমতা, অলজ্জতা, অলসশান্তিপ্রিয়তা, অশিক্ষিতপটুত্ব, অশিষ্টতা, অশ্রদ্ধেয়তা, অসংশয়তা, অসচ্ছলতা, অসত্যপরতা, অসমকক্ষতা, অসমানতা, অসম্পূর্ণতা, অসম্বদ্ধতা, অসরলতা, অসাড়তা, অসামান্যতা, অসীমতা, অসীমায়নতা, অস্মিতা, অহেতুকতা, আকৃষ্টিপরতা, আগ্নেয়তা, আড়ষ্টতা, আত্মতা, আত্মসহায়তা, আত্মসার্থকতা, আত্মস্বকীয়তা, আত্মিকতা, আদিমতা, আনুপূর্বিকতা, আবদ্ধতা, আবশ্যিকতা, আবিলতা, আলজ্জতা, আলস্যপরতা, ইংরেজিগ্রস্ততা, ইউরোপীয়তা, ইচ্ছান্ধতা, ইচ্ছাবধিরতা, ইতরতা, ইতিহাসহীনতা, ইন্দ্রিয়গম্যতা, উচ্ছলতা, উদ্‌বেলতা, উদ্‌যোগপরতা, উদ্‌যোগিতা, উন্মত্ততা, উপযুক্ততা, উপযোগিতা, উপহাস্যতা, ঊর্ধ্বগামিতা, এককতা, একতানতা, একনায়কতা, একপ্রবণতা, একাকারতা, একাকিতা, একাত্মতা, একাত্মকতা, একাত্মিকতা, একান্ততা, একালীয়তা, একীকরণতা, ঐকত্রিকতা, ঐতিহাসিকতা, ঔদরিকতা, কঠোরতা, কদাশয়তা, কর্তব্যতা, কর্তব্যপরতা, কর্তব্যপরায়ণতা, কর্মনিষ্ঠতা, কর্মপরতা, কর্মশীলতা, কর্মিষ্ঠতা, কাঁদুনিতা, কামশ্চারিতা, কামরূপধারিতা, কারুকারিতা,

কার্যকারিতা, কালহীনতা, কাল্পনিকতা, কাষ্ঠপ্রফুল্লতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, কুফলতা, কুরূপতা, কুশাগ্রবুদ্ধিতা, কুশ্রীতা, কৃতকর্মতা, কৃতকারিতা, কৃতবিদ্যতা, কৌতুকপরতা, ক্ষুণ্ণতা, ক্ষুদ্রতা, ক্ষুধাকরতা, ক্ষুধাতুরতা, ক্ষুব্ধতা, খণ্ডতা, খামখেয়ালিতা, গহনতা, গোচরতা, গোলতা, ঘটনাবহুলতা, ঘৃণাব্যঞ্জকতা, ঘৃণ্যতা, চরমতা, চরিতার্থকতা, চলনশীলতা, চাণক্যতা, চিত্রযোগ্যতা, চিরন্তনতা, চিরপ্রসন্নতা, চৈতন্যময়তা, ছিন্নবিচ্ছিন্নতা, জঘন্যতা, জঙ্গলতা, জটিলতা, জড়তা, জরাজীর্ণতা, জলীয়তা, জ্ঞেয়তা, তৎপরতা, তথ্যতা, তার্কিকতা, তামসিকতা, তুচ্ছতা, তুলনীয়তা, তুল্যতা, ত্যাগপরতা, ত্যাগশীলতা, দীর্ঘকালবর্তিতা, দীর্ঘজীবিতা, দুঃখকরতা, দুঃসাধ্যতা, দুঃসাহসিকতা, দুর্গমতা, দুর্জ্ঞেয়তা, দুর্বারতা, দুর্মানুষতা, দুর্লভতা, দুস্তরতা, দুষ্প্রাপ্যতা, দূরগামিতা, দূরমনস্কতা, দূরীকরণতা, দূষণীয়তা, দৃঢ়চিত্ততা, দৃঢ়নির্ভরতা, দেশহিতৈষিতা, দ্রুততা, দ্বৈপায়নতা, ধনহীনতা, ধর্মপরতা, ধর্মপ্রাণতা, ধর্মভীরুতা, ধার্মিকতা, ধ্যানপরতা, ধ্যানলীনতা, ধ্রুবতা, নাটকীয়তা, নায়কতা, নিঃশব্দতা, নিঃশেষতা, নিঃসাড়তা, নিঃসীমতা, নিঃস্বতা, নিকটবর্তিতা, নিকটলগ্নতা, নিখিলতা, নিত্যনির্বিকারতা, নিত্যসন্ধানপরতা, নিদারুণতা, নিম্নগতা, নিম্নবর্তিতা, নিয়মলোলুপতা, নিরন্তরতা, নিরবচ্ছিন্নতা, নিরাকুলতা, নির্জীবতা, নির্ধনতা, নির্ভরতা, নির্মমতা, নির্মলতা, নির্মাণপরতা, নিরর্থকতা, নিরাতঙ্কতা, নিশ্চলতা, নিশ্চিন্ততা, নিশ্চেতনতা, নিশ্চেষ্টতা, নিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা, নিষ্ফলতা, নিসংশয়তা, নিস্তেজতা, নীরসতা, নৈসর্গিকতা, ন্যায়পরতা, ন্যায়ভীরুতা, পক্ষপাতপরতা, পঙ্কিলতা, পণ্ডতা, পরতন্ত্রতা, পরনির্ভরতা, পরপরায়ণতা, পরবশতা, পরার্থপরতা, পরিধেয়তা, পরিপুষ্টতা, পরিমাপ্যতা, পশ্চাদ্বর্তিতা, পারগামিতা, পারিবারিকতা, পাশবতা, পাশ্চাত্যিকতা, পিপাসুতা, পীড়াকরতা, পূর্বগামিতা, পূর্বপরতা, প্রকাশ্যতা, প্রকৃষ্টতা, প্রগাঢ়তা, প্রতিপক্ষতা, প্রত্যক্ষগোচরতা, প্রত্যক্ষতা, প্রবলতা, প্রভুতা, প্রলুব্ধতা, প্রসন্নতা, প্রাচীনতা, প্রাঞ্জলতা, প্রামাণিকতা, বচনীয়তা, বন্ধুতা, বন্ধুরতা, বয়স্কতা, বলশালিতা, বলিষ্ঠতা, বল্লভতরতা, বহির্গমতা, বহুরাজকতা, বাধ্যতা, বাস্তবিকতা, বাহ্যিকতা, বিক্ষিপ্ততা, বিচিত্রতা, বিদ্যমানতা, বিনম্রতা, বিপুলতা, বিপর্যস্ততা, বিমর্ষতা, বিমিশ্রতা, বিরলতা, বিরোধপরতা, বিশিষ্টতা, বিশ্বজাগতিকতা, বিশ্বজাতীয়তা, বিশ্বব্যাপিকতা, বিশ্বভৌমিকতা, বিশ্বম্ভরিতা, বিশ্বাসজনকতা, বিশ্বাসপরতা, বিশ্বাসমুগ্ধতা, বিশ্বাসহীনতা, বিস্ফারতা, বিস্ময়করতা, বীভৎসতা, ব্যক্তিকতাহীন, ব্যগ্রতা, ব্যবহারকুশলতা, ব্যস্ততা, ব্রাহ্মিকতা, ভক্তিবৎসলতা, ভঙ্গুলতা, ভদ্রস্থতা, ভবিতব্যতা, ভয়ংকারিতা, ভাববাতিকতা, ভাবুকতা, ভিক্ষাজীবিতা, ভিন্নতা, ভীষ্মতা, ভূরিব্যয়িতা, ভোগ্যতা, ভ্রষ্টতা, মধ্যস্থতা, মননশীলতা, মনোজয়িতা, মনোবিহীনতা, মনোহারিতা, মমতা, মলিনতা, মহাজনশূন্যতা, মহাশূন্যতা, মহোচ্চতা, মানসিকতা, মুক্তহস্ততা, মুখরতা, মূকতা,

ম্লানতা, যথাপরিমিততা, যথাযোগ্যতা, যান্ত্রিকতা, য়ুরোপীয়তা, যোগ্যতমতা, যোগ্যতা, যোজনশীলতা, যৌবনমত্ততা, রঙিনতা, রাষ্ট্রনীতিকতা, রিক্ততা, রূঢ়তা, রোগাবিষ্টতা, লজ্জাকরতা, লাঘবতা, লুব্ধতা, লোকপূজ্যতা, লোকহিতৈষিতা, লোলতা, লোলুপতা, শান্ততা, শারীরিকতা, শাস্ত্রদ্রোহিতা, শিক্ষিতমূর্খতা, শিষ্টতা, শীলতা, শূন্যতা, শোচনীয়তা, শোভনতা, শ্রমপরতা, শ্রেষ্ঠতা, সংক্রামকতা, সংলগ্নতা, সকরুণতা, সচেতনতা, সচেষ্টতা, সচ্ছলতা, সজনতা, সজাগতা, সত্যচারিতা, সত্যপরতা, সত্যপরায়ণতা, সত্বরতা, সন্ধানপরতা, সবলতা, সবেগতা, সব্যসাচিতা, সমকক্ষতা, সমগ্রতা, সমতলতা, সমতুল্যতা, সমীক্ষকারিতা, সমীচীনতা, সমূলকতা, সম্পূর্ণতা, সম্ভবতা, সম্ভবপরতা, সম্ভাব্যতা, সম্মুখগমতা, সম্মুখগামিতা, সরসতা, সরাজকতা, সর্বজনগম্যতা, সর্বজনীনতা, সর্বভূমিনতা, সসীমতা, সহজতা, সহাস্যতা, সাধারণতা, সাধ্বীতা, সাবধানিতা, সামান্যতা, সাম্রাজ্যমদমত্ততা, সাম্রাজ্যলোলুপতা, সাম্রাজ্যিকতা, সার্বজনীনতা, সার্বজাতিকতা, সার্বভৌমিকতা, সাহসিকতা, সুগমতা, সুতীক্ষ্ণতা, সৃষ্টিপরতা, সেবাপরতা, স্তব্ধতা, স্থানিকতা, স্পর্শক্রামকতা, স্বজাতীয়তা, স্বতোবিরুদ্ধতা, স্বতোবিরোধিতা, স্বদেশীয়তা, স্বদেশহিতৈষিতা, স্বর্গীয়তা, স্বল্পতা, স্বাজাতিকতা, স্বাতন্ত্র্যপরতা, স্বাদেশিকতা, স্বানুবর্তিতা, স্বার্থপরতা, হাস্যতা, হৃদয়ালুতা।

তি। অনুস্মৃতি, অভিভূতি, অলংকৃতি, অসংবৃতি, আকৃষ্টিপরতা, আনুরক্তি, আবিষ্কৃতি, আবৃতি, তিরস্কৃতি, নিঃসৃতি, নিভৃতি, নিরাপত্তি, পরিপূর্তি, প্রজাতি, প্রজ্ঞপ্তি, লিপ্তি, লুপ্তি।

তৃন্। ঘটয়িতা, চেতয়িতা, পরিবেষ্টিতা, শোষয়িতা, সঞ্চয়িতা (অর্থসঞ্চয়িতা)।

ত্ব। অকিঞ্চিৎকরত্ব, অকৃতিত্ব, অজস্রত্ব, অধিপতিত্ব, অনন্যতন্ত্রত্ব, অবতারত্ব, অসতীত্ব, অসাধারণত্ব, আগুনত্ব, আত্মত্ব, ঈশ্বরত্ব, উৎসবত্ব, একাকিত্ব, একজাতিত্ব, একনায়কত্ব, কন্যাপিতৃত্ব, কালব্যাপকত্ব, ক্ষণস্থায়িত্ব, গৃহিত্ব, গোলত্ব, চমৎকারিত্ব, চাষাত্ব, চিরত্ব, ছাত্রত্ব, তনুত্ব, দেশীয়ত্ব, ধনিত্ব, ধ্রুবত্ব, নায়কত্ব, নিজত্ব, নিত্যত্ব, নিয়তত্ব, ন্যাশনালত্ব, পঞ্চায়েত্ব, পরত্ব, প্রিয়ত্ব, বড়োত্ব, বড়োলোকত্ব, বন্ধুত্ব, বন্ধ্যাত্ব, বহুত্ব, বারংবারত্ব, বিদেশীয়ত্ব, বিশালত্ব, বিশ্বনেশনত্ব, ভালোত্ব, ভীষণত্ব, ভূতত্ব, ভোক্তৃত্ব, মমত্ব, মহাদূরত্ব, রসালসজড়ত্ব, রাজচক্রবর্তিত্ব, রাজ্যেশ্বরত্ব, সখীত্ব, সভাকর্তৃত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, সহিতত্ব, সৃজনকর্তৃত্ব, স্থিরত্ব, স্বকীয়ত্ব, স্বজাতিত্ব, স্বয়ম্ভুত্ব।

দার। আসমানদার, ঘুমদার।

পনা।[৩] কচিমেয়েপনা, গুণপনা, বাল্য-পনা, সুন্দরীপনা।

বৎ। আত্মীয়বৎ, গ্রন্থবৎ, চিরাভ্যাসবৎ, প্রত্যক্ষবৎ, প্রাণবৎরূপে, বজ্রসারবৎ, বিদ্যুৎবৎ, যন্ত্রচালিতবৎ, সত্যবৎ, সম্ভববৎ, স্থাণুবৎ, স্বপ্নবৎ।

৩। "সবগুলোর মধ্যেই কটাক্ষপাত।" র-র ২৬।৪২৪ পৃ.।

বতুপ্। অধিকারবান, অস্তবান, অন্নবান, অর্থবান, অশ্রদ্ধাবান, আকৃতিবান, আত্মবান, আস্থাবান, উৎকর্ষবান, উপকরণবান, ঐশ্বর্যবান, কর্ণবান, কম্পবান, কলাবান, ক্রিয়াবান, চক্রবান, চিত্তবান, চেতনাবান, জীবনবান, দয়াবান, ধারাবান, ধৈর্যবান, ধ্বনিবান, নীলরক্তবান, পুচ্ছবান, প্রকাশবান, প্রতিষ্ঠাবান, প্রাণবান, ফলবান, বিদ্বেষবান, বৈচিত্র্যবান, বৈরাগ্যবান, বোধবান, ভারবান, ভাষাবান, রূপবান, শাখাবান, শাস্ত্রচর্চাবান, শৌর্যবান, সংস্কৃতিবান, সত্যবান (সত্যশালী), সম্পদবান, সহায়বান, সাদৃশ্যবান, সামর্থ্যবান, সারবান, সুরুচিবান, হৃদয়বান, কলাবতী, বিগ্রহবতী।

মতুপ্। আকৃতিমান্, কীর্তিমান, খ্যাতিমান্, গতিমান, জ্যোতিষ্মান, দীপ্তিমান, দৃষ্টিমান, ধ্বনিমান, প্রকাশমান, প্রখরবুদ্ধিমান, বিকাশমান, বেগমান, মতিমান, সংস্কৃতিমান, সমৃদ্ধিমান।

ময়। অনির্বচনীয় শোভাময়, আলোময়, আলোকময়, আশাময়ী, কায়াময়ী, গতিভঙ্গীময়, চিত্রময়ী, চিরধৈর্যময়ী, চেতনাময়, চৈতন্যময়, ছায়াময়, জড়তাময়, জনময়, জীবনময়, জ্ঞানময়, জ্যোতিঃসূত্রময়, জ্বালাময়, তারাময়ী, ধুলোময়, পরাণময়, পুলকময়, প্রাণময়, বস্তুময়, বিদ্যুৎ-শিখাময়ী, বৈদ্যুতময়, ব্যস্ততাময়, ভাবময়, মদিরহিল্লোলময়ী, মরুময়, মাঠময়, মানবময়, মায়াময়ী, মৃত্যুময়, রসময়, রেখাবর্ণময়, লাবণ্যময়, লাভময়ী, শরমময়ী, শান্তিময়, শূন্যময়, সংকটময়, সকলময়, সত্যময়, সন্তরণময়, সর্বময়, সর্বজগন্ময়, সহিষ্ণুতাময়ী, সুখময়, সুধাময়ী, স্বপ্নমোহময়ী, স্বর্গময়ী।

মান (শানচ্)। অভিব্যজ্যমান, অযুধ্যমান, আবর্তমান, গম্যমান, গর্জমান, চিরায়মান, চিরায়মানা, দহ্যমান, দীর্ঘায়মান, দীর্ঘায়মানা, নর্তমান, পলায়মান, প্রকাশমান, (নিত্য-)প্রসার্যমান, বিকাশমান, ব্যাপ্যমান, ভাসমান, মজ্জমান, মথ্যমান, মর্মরায়মাণ, মুহ্যমান, ম্লানায়মান, রুধ্যমান, রোরুদ্যমান, রোরুদ্যমানা, লম্ফমান, লুণ্ঠ্যমান, লোলুপায়মান, সঙ্কলমান, সঞ্চয়ীমান, স্পন্দমান, স্যন্দমান।

"শানচ্ প্রত্যয়ের বা তাহার 'মান' রূপের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এই প্রত্যয় কেবল আত্মনেপদী ধাতুর পরই ব্যবহৃত হইতে পারে। বাংলায় কিন্তু ইহা নির্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে।"
—ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, পৃ.৭।

য। নাশ্য, পরিহাস্য, পেয়, স্পৃশ্য, আকিঞ্চন্য, আনুচর্য, ঔৎসুক্য, দ্বৈধব্য, নিশাচর্য, নিষ্কারুণ্য, নৈঃশব্দ্য, নৈষ্কর্ম্য, নৈষ্ফল্য, পাঞ্চভৌত্য, পারাশিত্য, প্রাথম্য, ভিক্ষাচর্য, মৌলিন্য, যথাযথ্য, যমদৌত্য, যাথাযথ্য, সাজাত্য, সাধব্য, সারথ্য, সার্থক্য, সৌজাত্য, সৌষম্য, সৌসাম্য, সৌহৃদ্য, স্বারাজ্য।

বৈচিত্র্যপ্রিয়তার জন্য কখনো ছন্দের অনুরোধে, কখনো বা অন্ত্য মিলের জন্য, প্রচলিত শব্দের ঈষৎ রূপান্তরিত-রূপে প্রয়োগ করেছেন।

সাধারণত আকারান্তরূপে ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তে অকারান্ত শব্দ—

অনুশোচন (অনুশোচনা), আলিপন (আলিপনা), আলোচন (আলোচনা), অবতারণ (অবতারণা), আবর্জন (আবর্জনা), উদ্‌ভাষণ (উদ্‌ভাষণা), উপশির (উপশিরা), কল্পন (কল্পনা), জলধার (জলধারা), বন্দন (বন্দনা), বর্ণন (বর্ণনা)' পদচারণ (পদচারণা), পরিচালন (পরিচালনা), বেদন (বেদনা), রচন (রচনা), সমালোচন (সমালোচনা), সাধন (সাধনা), সান্ত্বন (সান্ত্বনা), সংকল্পন (সংকল্পনা), সমভ্যর্থন (সমভ্যর্থনা)।

এই নিয়মের বিপরীতটিও দেখা যায়: অনুধাবনা (অনুধাবন), অনুবর্তনা (অনুবর্তন), অনুশীলনা (অনুশীলন), অসম্মাননা (অসম্মান), উদ্‌বেজনা (উদ্‌বেজন) উদ্‌ভাবনা (উদ্‌ভাবন), পাঠনা (পাঠন), প্রণোদনা (প্রণোদন), বিচারণা (বিচারণ), পরিশীলনা (পরিশীলন), সম্ভাষণা (সম্ভাষণ), স্থাপনা (স্থাপন)।

প্রচলিত অনটন্ত শব্দের বদলে অ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ—

উন্মীল (উন্মীলন), উন্মূল (উন্মূলন), গর্জ (গর্জন), পদচার (পদচারণ), প্লাব (প্লাবন)।

এই রীতির বিপরীত রীতি—

অগ্রসরণ (অগ্রসর), অনুপ্রাণন (বাংলায় প্রচলিত অনুপ্রাণিত শব্দের বিশেষ্যরূপ), আভাষণ (আভাষ), আভাসন (আভাস), আলাপন (আলাপ), ত্রাসন (ত্রাস), ধ্বংসন (ধ্বংস), নির্ঘোষণ (নির্ঘোষ), পরিস্ফুটন (পরিস্ফুট), প্রবাহণ (প্রবাহ), বহিষ্করণ (বহিষ্কার), বিচারণা (বিচার), পদচারণ, পদচারণা (পদচার), বিধ্বংসন (বিধ্বংস), রাজ্যভ্রংশন (রাজ্যভ্রংশ), সংকল্পন (সংকল্প)।

প্রচলিত শব্দের উপসর্গের যোগ-বিয়োগেও শব্দে নতুনত্ব এনেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি: উৎপূর্ণ (পূর্ণ), আলোচক (সমালোচক), নন্দিত (আনন্দিত), সংকল্পন (কল্পন), সংকল্পনা (কল্পনা), সম্ভোগী (ভোগী), বিধর্ষিত (ধর্ষিত), বিনিঃসৃত (নিঃসৃত), বিপ্লাবন (প্লাবন), বিমিশ্রিত (মিশ্রিত), সারণ (অপসারণ), স্ফোরণ (বিস্ফোরণ), বিশঙ্কিত (শঙ্কিত), আবর্জন (বর্জন), আবর্জিত (বর্জিত), সমারম্ভ (আরম্ভ)।

রবীন্দ্রনাথ পরপদরূপে বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর কিছু নতুন বলে বৈচিত্র্য দেখা যায়। অনেক স্থলে প্রত্যয়ান্ত শব্দকেও পরপদরূপে ব্যবহার করতে দেখা যায়। নীচে এ শ্রেণীর পরপদের শব্দতালিকা দেওয়া গেল। এই তালিকা ত্রুটিহীনও নয়, নিঃশেষিতও নয়।

অংশ (অন্তরংশ, ইতিহাস-অংশ, জীবনাংশ, বহিরংশ, শরীরাংশ, হৃদয়াংশ), অঙ্কিত (তৃণাঙ্কিত, পুলকাঙ্কিত, লেখাঙ্কিত, লোমাঙ্কিত, স্বেদাঙ্কিত), অতীত (আয়ত্তাতীত, চিন্তনাতীত, জগৎ-অতীত, তিমিরাতীত, প্রত্যয়াতীত, প্রত্যাশাতীত, ভাষাতীত,

সম্ভবাতীত), অধীন (শুশ্রূষাধীন, সংস্কারাধীন), অনুজীবী (সাহেবানুজীবী), অনুবর্তী (পদানুবর্তী), অনুষ্ঠান (মঙ্গলানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদনুষ্ঠান, হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র), অন্তর (একান্তর, কর্মান্তর, কার্যান্তর কালকালান্তর, দিশান্তর, দেহান্তর, বর্ণান্তর, বিশ্বান্তর, বেশান্তর, ভাষান্তর, সোপানান্তর, স্তনান্তর), অন্তরিত (দেশান্তরিত, দ্বীপান্তরিত, ভাষান্তরিত, রূপান্তরিত), অন্ধ (দর্পান্ধ, ভ্রমান্ধ, স্বেচ্ছান্ধ), অন্বিত (কম্পান্বিত, কম্পান্বিতা, ত্বরান্বিত, মহিমান্বিত, মিষ্টান্বিতা, মূর্ছান্বিত, লজ্জান্বিত, লীলান্বিত, সংশয়ান্বিত), অপেক্ষী (প্রসাদ-অপেক্ষী, মাতৃস্নেহাপেক্ষী), অভিঘাত (তরঙ্গাভিঘাত, প্রলয়াভিঘাত, স্পন্দনাভিঘাত), অভিহত (তরঙ্গাভিহত, দুঃখাভিহত, ভয়াভিহত), আকীর্ণ (বিপদাকীর্ণ, সংশয়াকীর্ণ), আগার (চিরস্মরণীয়াগার, ছাত্রাগার, পরীক্ষাগার, বিচার-আগার, বিদ্যাগার, রহস্যাগার, স্বাস্থ্যাগার), আচরণ (সত্যাচরণ), আচার (পথ্যাচার, পাশবাচার, ভদ্রাচার), আচারী (অদ্ভুতাচারী, অধর্মাচারী, কপটাচারী, বিরুদ্ধাচারী, মিথ্যাচারী, ম্লেচ্ছাচারী, যন্ত্রাচারী), আতুর (তন্দ্রাতুর, বেদনাতুর, ভয়াতুর, মূর্ছাতুর, রোগাতুর, লোভাতুর, সংকটাতুর, স্তন্যভারাতুর, ব্যথাতুরা), আবহ (করুণাবহ, বিপদাবহ), আবিষ্ট (নিদ্রাবিষ্ট), আলয় (ভজনালয়), আলাপ (কবিতালাপ, বিদ্যালাপ, শিষ্টালাপ, স্নেহালাপ, হাস্যালাপ), আস্পদ (আশাস্পদ, সম্মানাস্পদ), উজ্জ্বল (শান্তোজ্জ্বল, সৌম্যোজ্জ্বল, হাস্যোজ্জ্বল), উৎপাত (হাস্যোৎপাত) উদ্দীপ্ত (ধ্যানোদ্দীপ্ত), উল্লোল (কলোল্লোল, প্রোল্লোল), কণ্ঠে (অবরুদ্ধকণ্ঠে, অবিচলিতকণ্ঠে, অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে, ক্লিষ্টকণ্ঠে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, ভীতকণ্ঠে, মেঘগম্ভীরকণ্ঠে, রুদ্ধকণ্ঠে, রুদ্ধরোদনকণ্ঠে, শ্রান্তকণ্ঠে, সস্নেহকণ্ঠে), কর (অনর্থকর, অপমানকর, অবমানকর, অমঙ্গলকর, অরুচিকর, অশান্তিকর, অশুচিকর, অশুভকর, অশ্রদ্ধাকর, অসম্মানকর, অসুখকর, অসুবিধাকর, অস্বাস্থ্যকর, আড়ষ্টকর, আত্মআঘাতকর, আনন্দকর, আয়ুক্ষয়কর, উন্নতিকর, ঔৎসুক্যকর, কর্ণবধিরকর, কল্যাণকর, কারুকর, ক্লান্তিকর, ক্লেশকর, ক্ষুধাকরতা, খোদাইকর, গৌরবকর, চাটুকর, চিত্তপ্রফুল্লকর, চিত্রকর, দুঃখকর, দুঃসাধ্যকর, দুর্গতিকর, নিরানন্দকর, নিঃশ্বাসরোধকর, পঞ্চভূতবন্ধনকর, পরমদুঃখকর, পীড়াকর, পৌরুষক্ষয়কর, প্রাণান্তকর, প্রীতিকর, বধিরকর, বিশুদ্ধপ্রীতিকর, বিলম্বকর, বেদনাকর, মঙ্গলকর, ময়স্কর, মূর্ছাকর, মুক্তিকর, লাভকর, শান্তিকর, শ্রান্তিকর, সর্বজনমোহকর, সুখকর, সুবিধাকর, সৃষ্টিকর, স্নেহোদ্বেলকর, স্বদেশহিতকর, হৃদয়দাহকর), কর্তা (ঘোটকর্তা, নকলকর্তা, ব্যাখ্যাকর্তা, যজ্ঞকর্তা, রচনাকর্তা, শাসনকর্তা, সৃজনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা), কাঙাল (সঙ্গকাঙাল, মধুকাঙালী), কাতর (অনিদ্রাকাতর, ঈর্ষাকাতর, ক্লেশকাতর, গ্রীষ্মকাতর, ঘাতকাতর, চিন্তাকাতর, নিরাশাকাতর, প্রেমকাতর, বিচ্ছেদকাতর, বিরহকাতর, যৌবনকাতর, লজ্জাকাতর, স্পর্শকাতর), কানা (তারিখকানা, রংকানা, রঙকানা, রূপকানা, সংসারকানা, সুরকানা), কাণ্ড (বিচিত্রকাণ্ড), কার (অস্ত্রকার, আবৃত্তিকার, গল্পকার, পথকার, প্রাণশিল্পকার, বীনকার, ব্যাকরণকার, রূপকার, শাস্ত্রকার, শিল্পকার, সংগ্রহকার, সাহিত্যকার, সীটকার, হীহীকার), কারক (আবৃত্তি-

কারক, (ব্যাখ্যাকারক), কারী (অন্যায়কারী, অবজ্ঞাকারী, আজ্ঞাকারী, আপত্তিকারী, আহ্বানকারী, উৎপাতকারী, দুষ্কর্মকারী, দুষ্কৃতিকারী, নিমন্ত্রণকারী, প্রত্যক্ষকারী, প্রশ্নকারী, প্রস্তাবকারী, ভয়কারী, রচনাকারী, লড়াইকারী, সহায়কারী, সৃষ্টিকারী, স্নানকারী, হিতকারী, হ্রাসকারী, কৃতকারিতা, প্রশ্নকারিণী, সেবাকারিণী), কামী (বাঁধনকামী, স্বাস্থ্যকামী), কীর্ণ (কুসুমকীর্ণ), কুণ্ঠ (ভয়কুণ্ঠ), কুশল (সৃষ্টিকুশলী), কুহর (কেন্দ্রকুহর, চিত্তকুহর, প্রাণের কুহর, বক্ষঃকুহর, মর্মকুহর, মানসকুহর, শঙ্খকুহর) কৃত্য (অতিথিকৃত্য, অবশ্যকৃত্য, কৃতকৃত্য, দিনকৃত্য, প্রভুকৃত্য, বন্ধুকৃত্য, সমরকৃত্য, সমাজকৃত্য, স্বেচ্ছাকৃত্য), কোমল (বিনম্রকোমল), ক্রমে (অনুবৃত্তিক্রমে, অভ্যাসক্রমে, দুর্দৈবক্রমে, ধীরক্রমে, শুভদৈবক্রমে, সময়ক্রমে), ক্ষোভ (কর্মক্ষোভ, চিত্তক্ষোভ, তরঙ্গক্ষোভ), খচিত (কারুখচিত, খাপরেলখচিত, ছায়াখচিত, তারাখচিত, পুষ্পখচিত, বিচিত্র-কারুখচিত, শুভ্রমেঘমাল্যখচিত, সুখেদুঃখেখচিত সূচিমুখকণ্টকখচিত) খণ্ড (কার্যখণ্ড, চন্দ্রখণ্ড, চিন্তাখণ্ড, ধরাখণ্ড, স্বর্গখণ্ড), গড়া (আপনগড়া, আপিসে-গড়া, ঘরগড়া, ঘরে-গড়া, দলগড়া, শাস্ত্রগড়া, সমাজগড়া, সায়ান্সেগড়া), গত (অবস্থাগত, অসাম্যগত, আকারগত, আত্মগত, আবৃত্তিগত, আয়ত্তগত, ইতিহাসগত, কবিতাগত, কাব্যগত, কালগত, গৃহগত, জীবনগত, টাকাগত, তথ্যগত, তুলনাগত, দেশগত, ধর্মগত, নিদ্রাগত, পরিভাষাগত, পল্লীগত, পুঁথিগত, প্রকারগত, প্রকৃতিগত, প্রথাগত. প্রয়োজনগত, প্রাণগত, বর্ণগত, বস্তুগত, বহুচেষ্টাগত, বিলাসগত, বুদ্ধিগত, বৃত্তিগত, বেদনাগত, ব্যক্তিবিশেষগত, ব্যবসাগত, ব্যবহারগত, ব্যাকরণগত, ভাবগত, মর্মগত, মূলগত, যুক্তিগত, রক্তগত, রুচিগত, লক্ষণগত, লজিকগত, শাস্ত্রগত, শ্রেণীগত, সংসারগত, সংস্কারগত, সত্যগত, সমাজগত, সর্বগত, সাহিত্যগত, সৌন্দর্যগত, স্পর্শগত, স্বভাবগত, স্বরূপগত, স্বার্থগত, হৃদয়গত, স্বামীদূরগতা), গম্ভীর (অরণ্যগম্ভীর, ছায়াগম্ভীর, তিমিরগম্ভীর, ধৈর্যগম্ভীর, বজ্রগম্ভীর, সৌম্যগম্ভীর, স্নিগ্ধগম্ভীর), গম্য (অধিকারগম্য, অনুভবগম্য, অশ্রুতিগম্য, আয়ত্তগম্য, আয়ত্তিগম্য, আলোকগম্য, ইন্দ্রিয়গম্য, কল্পনাগম্য, জ্ঞানগম্য, ধারণাগম্য, প্রতীতিগম্য, প্রত্যক্ষগম্য, প্রত্যয়গম্য, বচনগম্য, বুদ্ধিগম্য, ভাবগম্য, যুক্তিগম্য, শ্রুতিগম্য, সর্বজনগম্য, সহজগম্য, স্পর্শগম্য, স্মৃতিগম্য, হৃদয়গম্য), গহন (গন্ধগহন, তিমিরগহন, নিদ্রাগহন, স্বপনগহন, ভবগহন, হৃদয়গহন), গামী (অন্তর্গামী, আকাশগামী, আসমান-গামী, উত্তরগামী, তীর্থগামী, বহির্গামী, মূলগামী, সর্বগামী, সুখমন্থরগামী), গামিনী একাগ্রগামিনী, গজগামিনী, চঞ্চলগামিনী, মরালগামিনী), গোচর (অনুভবগোচর, আয়ত্তগোচর, ইন্দ্রিয়গোচর, ঈষৎগোচর, উপলব্ধিগোচর, দৃষ্টিগোচর, প্রতীতিগোচর, প্রত্যক্ষগোচর, প্রত্যয়গোচর, ভাবগোচর. লক্ষগোচর, লক্ষ্যগোচর, শ্রুতিগোচর, সহজগোচর , গ্রাহী (চিত্তগ্রাহী, সর্বগ্রাহী), গ্রস্ত (অশিক্ষাগ্রস্ত, ইংরেজিগ্রস্ততা, কুণ্ঠাগ্রস্ত, মারীগ্রস্ত), গ্রাহ্য (সাহিত্যগ্রাহ্য), ঘটনা (নাট্যঘটনা, প্রিয়ঘটনা, বিশ্বঘটনা , শোক-ঘটনা), ঘটিত (আত্মরক্ষাঘটিত, দেহসংস্থানঘটিত, দৈবঘটিত, পবিত্রতাঘটিত, ব্যাকরণ-

ঘটিত, মানুষঘটিত, যথেচ্ছাঘটিত, শাস্ত্রঘটিত, স্বাস্থ্যঘটিত), ঘন (অন্ধকারঘন, আনন্দঘন, কনককিরণঘন, করুণাঘন, কালিমাঘন, ছায়াঘন, তিমিরঘন, দূর্বাদলঘন, নিকষঘন, নীপবনগন্ধঘন, প্রেমঘন, বর্ষণঘন, বেণুচ্ছায়াঘন, মর্মবেদনাঘন, মাধুর্যঘন, যৌবনঘন, রহস্যঘন, শ্রাবণঘন, শ্যামঘন, সংশয়ঘনছায়ে), ঘর (কৃপণঘর, গ্রাম্যঘর, দারিদ্র্যঘর, ধনীঘর, ধূলিঘর, পরীক্ষাঘর, পর্ণঘর, বিচারঘর, বিলাসিনীঘর, বৃহৎঘর, মন্দিরঘর, মানবঘর, যাত্রীঘর, রাজঘর, রুদ্ধঘর, শয়নঘর, শ্বশুরঘর, সভাঘর, সমাধিঘর), ঘাত (আত্মঘাত, নরঘাত, নিষ্ঠুরঘাত, বাক্যঘাত, বিশ্বাসঘাত, মর্মঘাত), ঘাতক (নরঘাতক, প্রাণঘাতক), ঘাতী (আত্মঘাতী, চিত্তঘাতী, নারীঘাতী, পিতৃমর্মঘাতী, পুত্রঘাতী, বিশ্বঘাতী, বিশ্বাসঘাতী, মর্মঘাতী, শিশুঘাতী, হৃদয়ঘাতী), চক্ষে (করুণচক্ষে, কল্পনাচক্ষে, ক্ষুধিতচক্ষে, ব্যাকুলচক্ষে, মনশ্চক্ষে, সহজচক্ষে), চর (অন্তশ্চর, অরণ্যচর, আকাশচর, আলোকচর, উষাচর, কর্দমচর, ক্ষণচর, গলিচর, গীতবীথিচর, গুহাচর, গোপনচর, ছায়াচর, তলচর, দলচর, নভশ্চর, নির্জনচর, পত্রচর, প্রান্তচর, ভাষাচর, ভিক্ষাচর, মরুচর, শ্মশানচর), চর্চা (পাণ্ডিত্যচর্চা, পৌরুষচর্চা, প্রকাশচর্চা, প্রণয়চর্চা, বস্তুচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, মনুষ্যত্বচর্চা, শিল্পচর্চা, সংযমচর্চা, সৌন্দর্যচর্চা), চারী (অজ্ঞাতচারী, অরণ্যচারী, আকাশচারী, (স্বাধীন-) গগনচারী, গোপনচারী, পথচারী, পদচারী, পর্বতচারী, প্রান্তরচারী, বনচারী, মরুচারী, শ্মশানচারী, কুঞ্জকুটির-চারিণী, কুটির-প্রান্তচারিণী, গোপনচারিণী, গৃহচারিণী, নিঃশব্দচারিণী, নিয়মচারিণী, পার্শ্বচারিণী, ব্রতচারিণী, যদৃচ্ছাচারিণী, শ্মশানচারিণী, স্বাতন্ত্র্যচারিণী), চিত্তে (অপরাজিত-চিত্তে, অপ্রমত্তচিত্তে, অসংকুচিতচিত্তে, অসন্দিগ্ধচিত্তে, আনন্দচিত্তে, একান্তচিত্তে, ক্রোধ-প্রজ্বলিতচিত্তে, নিঃশঙ্কচিত্তে, নিরভিমানচিত্তে, নিরাসক্তচিত্তে, নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে ব্যথিত-চিত্তে, ভারাক্রান্তচিত্তে, ভীতচিত্তে, শঙ্কিতচিত্তে, সকরুণচিত্তে, সবলচিত্তে), চ্যুত (অধিকারচ্যুত, আয়ত্তচ্যুত, মতচ্যুত), ছলে (লীলাচ্ছলে, হাস্যচ্ছলে), ছাড়া (ঘুমছাড়া, জগৎছাড়া, নিয়মছাড়া, বেদছাড়া, (ভাষার-নাগালছাড়া, ভূগোলছাড়া, সভ্যতাছাড়া, সময়ের বন্ধছাড়া, স্বর্গছাড়া), জগৎ (গ্রন্থজগৎ, বসতিজগৎ, বস্তুজগৎ, ব্যবহারজগৎ, (মরুজগৎ, মানসজগৎ, মায়াজগৎ), জন (সখীজন, গোপীবধূজন), জনক (অগৌরবজনক, অবজ্ঞাজনক, অবমানজনক, অবিশ্বাসজনক, আনন্দজনক, ঔৎসুক্য-জনক, চিত্তদৌর্বল্যজনক, তাপজনক, নিরুৎসাহজনক, পীড়াজনক, বিশ্বাসজনক, বিস্ময়-জনক, ব্যথাজনক, ভক্তিজনক, রসভঙ্গজনক, সন্তোষজনক, স্বাস্থ্যজনক হাস্যজনক, হিতজনক), জয়ী (বস্তুজয়ী, বস্তুরাজ্যজয়ী, মৃত্যুজয়ী, সর্ববাধাজয়ী, স্বার্থজয়ী), জাগ্রত (অনিমেষজাগ্রত, চিরজাগ্রত, নবজাগ্রত, নিত্যজাগ্রত, নিয়তজাগ্রত, নূতনজাগ্রত, পুনর্জাগ্রত, সদ্যোজাগ্রত), জাত (আকাঙ্ক্ষাজাত, তপস্যাজাত, দেবাংশজাত, পরজাত, মন্থনজাত, মরুজাত), জীবী (অন্নজীবী, আকর্ষণজীবী, কর্মজীবী, কর্ষণজীবী, ক্ষণজীবী, গদ্যজীবী, জালজীবী, পরজীবী পরশ্রমজীবী, প্রসাদজীবী, বাণিজ্যজীবী, ভূমিজীবী

মননজীবী, শোষণজীবী, সন্দেহজীবী, স্ববুদ্ধিজীবী), তত্ত্ব (আকর্ষণতত্ত্ব, ঐক্যতত্ত্ব, নিয়মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, যন্ত্রতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, লজ্জাতত্ত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব)। তন্ত্র (ইম্পীরিয়লতন্ত্র, একতন্ত্র, ঐক্যতন্ত্র, কর্তব্যতন্ত্র, জগৎতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, নব্যতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, পুরোহিতশাসনতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, প্রধানতন্ত্র, বিশ্বতন্ত্র, ব্যবস্থাতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, ভৃত্যরাজকতন্ত্র, মানসতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বকীয়তন্ত্র, স্বরাজতন্ত্র, স্বার্থতন্ত্র), তৎপর (কর্মানুষ্ঠানতৎপর, কার্যতৎপর, পলায়নতৎপর, সন্ধানতৎপর, সেবাতৎপর), তরণ (দুঃখ-তাপবিঘ্নতরণ, মৃত্যুতরণ, মোহ-গহন-তরণ), তল (চিত্ততল, দৃষ্টিতল, বাতায়নতল, মর্মতল, সংসারতল, হৃদয়তল, স্বপনতল), দীন (বাক্যদীন, বিজ্ঞানদীন), দৈন্য (অন্নদৈন্য, আস্থাদৈন্য, অর্থদৈন্য, চিত্তদৈন্য, জ্ঞানদৈন্য, প্রাণদৈন্য, শক্তিদৈন্য, স্বাস্থ্যদৈন্য); দৃপ্ত (গৌরবদৃপ্ত, দয়াদৃপ্ত); দৃষ্টি (বিশ্বদৃষ্টি, শিল্পদৃষ্টি); নৈতিক (গৃহনৈতিক, ধর্মনৈতিক, ব্যবহারনৈতিক, সমাজনৈতিক, পত্রিকা (দরখাস্তপত্রিকা, প্রশ্নপত্রিকা, প্রেমপত্রিকা), ধর (উষ্ণীষধর, দণ্ডধর), ধর্ম (কর্মধর্ম, চিত্তধর্ম, জৈবধর্ম, সজ্ঞাধর্ম), ধর্মী (জীবধর্মী, জীবনধর্মী, জ্বলনধর্মী, তরঙ্গধর্মী, প্রকাশধর্মী, বিস্মরণধর্মী, মরণধর্মী, মিলনধর্মী, সচলধর্মী, সহধর্মী, সাম্যধর্মী, স্বধর্মী), ধারী (অবয়বধারী, উষ্ণীষধারী, ঘড়িচেনধারী, দণ্ডধারী, দুঃসাধ্যব্রতধারী, ধর্মনামধারী, বেশধারী, শস্ত্রধারী, শুভ্রকোর্তাধারী, হলধারী)। নিঃস্ব (কীর্তিনিঃস্ব, রূপনিঃস্ব, শস্যনিঃস্ব), নীতি (ঐক্যনীতি, ধর্মনীতি, প্রেমনীতি, বলনীতি, বিশ্বনীতি, ভদ্রনীতি, মানবনীতি, রাজ্যনীতি, রাষ্ট্রশাসননীতি, সভ্যনীতি), পটু (রক্ষণপটু, সীবনপটু, স্বভাবপটু), পদে (কম্পিতপদে, নিঃশব্দপদে, ব্যগ্রপদে, সংকুচিতপদে), পন্থী (চরমপন্থী, ভারতপন্থী, মধ্যমপন্থী), পর (অন্যায়পরতা, অবজ্ঞাপরতা, অভ্যাসপরতা, অসত্যপরতা, আকৃষ্টিপরতা, আত্মনিবেদনপর, আত্মবিসর্জনপর, আনন্দনর্তনপর, আলস্যপরতা, উদ্‌যোগপরতা, কৌতুকপরতা, কর্তব্যপরতা, কর্মপরতা, কৌতূহলপরতা, ত্যাগপরতা, দুর্নীতিপরতা, ধর্মপরতা, ধ্যানপরতা, নিত্যসন্ধানপরতা, নির্ভরপরতা, নির্মাণপরতা, নৃত্যপর, ন্যায়পর, ন্যায়পরতা, পক্ষপাতপরতা, পরার্থপরতা, পলায়নপরতা, প্রাণবিসর্জনপর, বিরোধপরতা, বিশ্বাসপরতা, শ্রদ্ধাপরতা, শ্রমপরতা, সংশয়পরতা, সত্যপরতা, সন্ধানপরতা, সৃষ্টিপরতা, সেবাপর, স্বার্থপরতা), পরায়ণ (অত্যাচারপরায়ণ, অনন্যপরায়ণ, অবজ্ঞাপরায়ণ, অবিচারপরায়ণ, অশ্রদ্ধাপরায়ণ, আচারপরায়ণ, আতিথ্যপরায়ণ, আত্মত্যাগপরায়ণ, আত্মসুখপরায়ণ, আলোচনাপরায়ণ, উৎসাহপরায়ণ, উদ্‌যোগপরায়ণ, উদরপরায়ণ, একপরায়ণ, করুণাপরায়ণ, কর্মপরায়ণ, কল্যাণপরায়ণ, কৌতুকপরায়ণ, ক্ষমাপরায়ণ, চিন্তাপরায়ণ, তপঃপরায়ণ, দ্বিধাপরায়ণ, ধর্মপরায়ণ, ধ্যানপরায়ণ, নিদ্রাপরায়ণ, নির্ভরপরায়ণ, পরিহাসপরায়ণ, পরীক্ষাপরায়ণ, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, প্রতীক্ষাপরায়ণ, বিদ্বেষপরায়ণ, বিরোধপরায়ণ, বিশ্বাসপরায়ণ, বীজনপরায়ণ, ব্যভিচারপরায়ণ, ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ, শ্রদ্ধাপরায়ণ, সংগ্রামপরায়ণ, সংশয়পরায়ণ, সংসারব্রতপরায়ণ, সেবাপরায়ণ, একপরায়ণা, একতপঃ-

পরায়ণা, প্রাণবিসর্জনপরায়ণা, শোকপরায়ণা), পরিশূন্য (পাপপরিশূন্য, সংশয়পরিশূন্য), পাবন (চিত্তপাবন, বিশ্বপাবন, ভক্তিপাবন), পালন (পদ্ধতিপালন, ভদ্রতাপালন, সমাজপালন), পিপাসু (চা-পিপাসু, চাকরিপিপাসু, জ্ঞানপিপাসু, জ্যোতিপিপাসু), পিয়াসী (মধুপিয়াসী), পীড়িত (উপকরণপীড়িত, দৈন্যপীড়িত, দোলাপীড়িত), পুঞ্জ (কর্তব্যপুঞ্জ, কলুষপুঞ্জ, কারণপুঞ্জ, কুলায়পুঞ্জ, জগৎপুঞ্জ, ফেনপুঞ্জ, বস্তুপুঞ্জ, বিঘ্নপুঞ্জ, ভীরুতাপুঞ্জ, যৌবনপুঞ্জ, লাবণ্যপুঞ্জ, শক্তিপুঞ্জ, শব্দপুঞ্জ, হৃদয়পুঞ্জ), পুট (অধরপুট, কর্ণপুট, চক্ষুপুট), পূজক (পংক্তিপূজক, লিঙ্গপূজক, শক্তিপূজক, স্বাধীনতাপূজক), পূর্ণ (আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ, ভাষাপূর্ণ), প্রকৃতি (অন্তঃপ্রকৃতি, চিৎপ্রকৃতি, চিত্তপ্রকৃতি, জৈবপ্রকৃতি, বহিঃপ্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি, ভাষাপ্রকৃতি, মনঃপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতি, মানসপ্রকৃতি, সত্যপ্রকৃতি, সন্দিগ্ধপ্রকৃতি, সমাজপ্রকৃতি), প্রধান (কর্মপ্রধান, কার্যপ্রধান, প্রতিযোগিতাপ্রধান, বস্তুপ্রধান, ভাবপ্রধান, মঙ্গলপ্রধান, মানসপ্রধান, শক্তিপ্রধান, স্থিতিপ্রধান, স্বপ্রধান, স্বাতন্ত্র্যপ্রধান, স্বার্থপ্রধান), প্রবণ (বিশ্বাসপ্রবণ, স্থিতিপ্রবণ), প্রয়াসী (সঞ্চয়প্রয়াসী), প্রায় (অচলপ্রায়, অব্যক্তপ্রায়, অসত্যপ্রায়, অস্তপ্রায়, ছায়াপ্রায়, ছিন্নপ্রায়, জলবিন্দুপ্রায়, নিশ্চিতপ্রায়, পর্যবসিতপ্রায়, বিচলিতপ্রায়, বিলীনপ্রায়, বিলুপ্তপ্রায়, মরুপ্রায়, মাতৃরক্তপ্রায়, লব্ধপ্রায়), বক্ষে (কম্পিতবক্ষে, স্পন্দিতবক্ষে), বজ্র (পাপবজ্র, সংশয়বজ্র), বৎসল (দেশবৎসল, মাতৃকাবৎসল, লোকবৎসলা), বদ্ধ (অর্থবদ্ধ, অহংকারবদ্ধ, আকারবদ্ধ, দলিলবদ্ধ, দৃতবদ্ধ, দূরকালবদ্ধ, দূরস্মৃতিবদ্ধ, নামবদ্ধ, নিয়মবদ্ধ, বস্তুজগৎবদ্ধ, ব্যবহারবদ্ধ, ব্যূহবদ্ধ, ভাষাবদ্ধ, ভুজঙ্গপাশবদ্ধ, মণ্ডলবদ্ধ, মন্ত্রবদ্ধ, শাসনবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ, সম্প্রদায়বদ্ধ, স্বার্থসীমাবদ্ধ, স্বরবদ্ধ,), বর্তী (অতিবর্তী, অধিকারবর্তী, অন্তরালবর্তী, আকাশতলবর্তী, আত্মঙ্করবর্তী, একাগ্রলক্ষবর্তী, একান্তবর্তী, একপথবর্তী, একমতবর্তী, উত্তরবর্তী, উপরিবর্তী, কেন্দ্রবর্তী, গোচরবর্তী, চতুর্দিকবর্তী, চতুষ্পার্শ্ববর্তী, চরণবর্তী, চারিপার্শ্ববর্তী, তলবর্তী, দলবর্তী, দূরভবিষ্যৎবর্তী, নিয়তকালবর্তী, পথবর্তী, পরপারবর্তী, পুরোবর্তী, প্রত্যক্ষবর্তী, প্রথমঅঙ্কবর্তী, বহির্বর্তী, বাতায়নবর্তী, বালুতটবর্তী, মৃত্তিকাতলবর্তী, শেষসীমাবর্তী, সমকালবর্তী, সমাজবর্তী, সুদূরবর্তী, স্বপ্নবর্তী, অন্ধপ্রথাঞ্চলবর্তিতা, একান্নবর্তিতা, সহবর্তিনী, সিপ্রাতটবর্তিনী), বর্ষী (কণিকাবর্ষী, কল্যাণবর্ষী, বিদ্যুতবর্ষী, স্নেহবর্ষী, হাস্যবর্ষিণী), বশে (কর্মবশে, সখিবাৎসল্যবশে), বহ (ভাববহ), বাদ (অনুপাতবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, পরিণামবাদ, বিজ্ঞানবাদ, বিবর্তনবাদ), বাদী (অনুপাতবাদী, আচারবাদী, আবশ্যকবাদী, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী), বার্তা (পলায়নবার্তা, বিজয়বার্তা, বিরহবার্তা), বাসী (একান্তবাসী, দূরদেশবাসী, নির্জনবাসী, পরদেশবাসী, প্রান্তবাসী, বক্ষোবাসী, মাতৃঅঙ্কোটবাসী, নেপথ্যবাসিনী, পথবাসিনী, পর্বতবাসিনী), বিক্ষেপ (বাহুবিক্ষেপ, বিঘ্নবিক্ষেপবিকৃতি, ভ্রূকুটিবিক্ষেপ), বিজ্ঞান (জ্যোতিবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান), বিৎ(দ্) (ছন্দবিৎ, ব্যবহারবিদ্, ব্যাকরণবিৎ, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ), বিদ্ধ (গ্যাসালোকবিদ্ধ,

জ্যোতির্বিদ্ধ), বিদ্রোহী (সমাজবিদ্রোহী, স্বভাববিদ্রোহী), বিধাতা (ইতিহাসবিধাতা, জীবনবিধাতা, ভাগ্যবিধাতা, মঙ্গলবিধাতা, মানববিধাতা), বিধুর (গন্ধবিধুর, বিচ্ছেদবিধুর, বেদনাবিধুর, যৌবনাবেশবিধুর), বিভাসিত (জ্যোতির্বিভাসিত, নিত্যদীপ-বিভাসিত), বিরহিত (একবিরহিত, বিশ্ববিরহিত, সংশয়বিরহিত, সঙ্গীবিরহিতা), বিলাসী (অবকাশবিলাসী, আধুনিককালবিলাসী, দোলাবিলাসী, নিন্দাবিলাসী, প্রভাতবিলাসী, বাণীবিলাসী, বাস্তববিলাসী, মৃত্তিকাবিলাসী), বিহারী (অঙ্কবিহারী, অবকাশবিহারী, আকাশবিহারী, আত্মবিহারী, আপিসবিহারী, এককণ্ঠবিহারী, কল্পলোক-বিহারী, কোণবিহারী, গুহাবিহারী, গ্রন্থবিহারী, চণ্ডীমণ্ডপবিহারী, দূরবিহারী, নর্দমা-বিহারী, পঞ্জিকাবিহারী, বায়ুবিহারী, মনোবিহারী, মৃগয়াবিহারী, হৃদ্‌বিহারী), বিহীন (খ্যাতিবিহীন, গম্যবিহীন, নিঃশেষবিহীন, পিতৃবিহীন, পৌরুষবিহীন, ফলাফলবিচারবিহীন, বাক্যবিহীন, বিত্তবিহীন, বিরামবিহীন, শব্দবিহীন, সীমাবিহীন, হৃদ্যতাবিহীন, স্নেহবিহীনা), বীণা (অন্তরবীণা, অরুণবীণা, আঁধারবীণা, আলোবীণা, আলোকবীণা, ইন্দ্রিয়বীণা, কিরণবীণা, চিত্তবীণা, জীবনবীণা দেহবীণা, বক্ষবীণা, বিশ্ববীণা, ভুবনবীণা, মনোবীণা, মরণবীণা, মিলনবীনা, মৌনবীনা হৃদয়বীণা), বৃত্তি (কর্মবৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি, দয়াবৃত্তি, প্রীতিবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ভক্তিবৃত্তি, মমত্ববৃত্তি, সাবধানতাবৃত্তি, স্নেহবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, চরবৃত্তি, দাতাবৃত্তি, দাস্যবৃত্তি, পিসাবৃত্তি, শৃগালবৃত্তি), ব্যক্তি (ভাবব্যক্তি, স্নেহব্যক্তি), ব্যবসায় (জীবনব্যবসায়, প্রণয়ব্যবসায়, বিদূষণব্যবসায়, বিত্তাব্যবসায়)। ব্যবসায়ী (ধর্মব্যবসায়ী, নাট্যব্যবসায়ী, বিচারব্যবসায়ী, ব্যাকরণব্যবসায়ী, সাহিত্যব্যবসায়ী)। বিস্মৃত (ইতিহাসবিস্মৃত, কর্মবিস্মৃত, নিখিলবিস্মৃত, বিচিত্রবিস্মৃত)। ব্যাপার (আতিথ্যব্যাপার, প্রণয়ব্যাপার, বিনাশব্যাপার, বিপর্যয়ব্যাপার, বিবাহব্যাপার, ভোজনব্যাপার, মঙ্গল ব্যাপার, যুদ্ধব্যাপার, রাষ্ট্রব্যাপার, শিক্ষাসাধনব্যাপার, সৃষ্টিব্যাপার,)। ব্রত (লোকহিতব্রত, সংসারব্রতপরায়ণ, শুভব্রতা)। ব্রতী (মাধুকরীব্রতী, শুশ্রূষাব্রতী, স্বয়ংব্রতী), ভাজন (প্রতিষ্ঠাভাজন)। ভাব (বৈমুখভাব, লুব্ধভাব)। ভাবে (অকিঞ্চনভাবে, অখণ্ডভাবে, অচেতনভাবে, আপেক্ষিকভাবে, অনিদ্রভাবে, অন্ধভাবে, অপ্রত্যক্ষভাবে, অবহিতভাবে, অবান্তরভাবে, অবিকলভাবে, অবিনশ্বরভাবে, অব্যবহিতভাবে, অলক্ষিতভাবে, অলুব্ধভাবে, অসংশয়িতভাবে। অসন্দিগ্ধভাবে, অসামান্যভাবে, আলজ্জিতভাবে, উত্তানভাবে, গ্রাম্যভাবে, ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে, জননীভাবে, জিজ্ঞাসুভাবে, তত্ত্বভাবে, দৃঢ়গম্ভীরভাবে, দ্বিধা-ভাবে, নিগূঢ়ভারে, নিরাসক্তভাবে, নিরুপায়ভাবে, নীরন্ধ্রভাবে, পাশবভাবে, প্রীতিভাবে, প্রকৃতভাবে, প্রত্যক্ষভাবে, বন্ধুভাবে, বলিষ্ঠভাবে, বিক্ষিপ্তভাবে, বিচিত্রভাবে, বিজ্ঞভাবে, বিদ্রোহীভাবে, বিনম্রবিনীতভাবে, বিপরীতভাবে, বিবেচকভাবে, বিভ্রান্তভাবে, বিশেষজ্ঞ-ভাবে, বিশ্রব্ধভাবে, বিশ্বজনীনভাবে, ব্যথিতক্ষুব্ধভাবে, ব্যাপকভাবে, ভীতভাবে, মানুষভাবে, মুক্তভাবে, মূঢ়ভাবে, মৈত্রীভাবে, যথাযোগ্যভাবে, শান্তস্নিগ্ধভাবে, সচলভাবে, সচেতনভাবে, সচেষ্টভাবে, সজাগভাবে, সজীবভাবে, সজীবতরভাবে, সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সশরীরভাবে,

সম্পৃহভাবে, সুডোলভাবে, সুদূরভাবে, সুশোভনভাবে, সুস্থভাবে)। ভারতী (গীতভারতী, চিত্রভারতী, ভাষাভারতী, রসভারতী)। ভাষী (ভিন্নভাষী, সাধুভাষী)। ভীরু (অন্ধকারভীরু, অপরাধভীরু, আকাশভীরু, আচারভীরু, দুঃখভীরু, ন্যায়ভীরুতা, প্রণয়ভীরু, বন্ধনভীরু, ব্যাকরণভীরু, মরণভীরু, মরীচিকাভীরু, মর্যাদাভীরু, রোগভীরু, স্পর্শভীরু)। ভুক্ (নরভুক্, নরমাংসভুক্, বেতনভুক, সর্বভুক্)। ভূম (মল্লভূম, রণভূম)। ভূমি (আশ্রয়ভূমি, কেন্দ্রভূমি, চিত্তভূমি, প্রতিষ্ঠাভূমি, বিশ্বভূমি, বিশ্বরঙ্গভূমি, রঙ্গভূমি)। ভ্রষ্ট (আতিথ্যভ্রষ্ট, আলিঙ্গনভ্রষ্ট, ধৈর্যভ্রষ্ট, পরিমাণভ্রষ্ট, ভূমিকাভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, সৌজন্যভ্রষ্ট, স্থানভ্রষ্ট)। মণ্ডল (সহযোগী মণ্ডল)। মণ্ডলী (অরসিক মণ্ডলী, ইয়ার মণ্ডলী, উপাসিকামণ্ডলী, জ্যোতির্মণ্ডলী, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, ধর্মমণ্ডলী, প্রকাশমণ্ডলী, ফুলমণ্ডলী, বুধমণ্ডলী, শক্রমণ্ডলী, সখীমণ্ডলী)। মতে (উচ্চমতে, নানামতে, বিধানমতে, স্বেচ্ছামতে)। মনে (অসন্দিগ্ধ-মনে, নিঃশঙ্কমনে)। মুক্ত (বন্ধমুক্ত, বাধামুক্ত, বাসনামুক্ত, ভস্মমুক্ত, ভারমুক্ত, ভাষামুক্ত, মলিনতামুক্ত, স্বরমুক্ত, পথমুক্তি)। মুখী (কনকমুখী, স্বপ্নমুখী)। মুখে (অপ্রসন্নমুখে, অবিচলিতমুখে, নম্রমুখে, পাংশুবর্ণমুখে, প্রফুল্লমুখে, প্রসন্নকল্যাণমুখে, লজ্জিতমুগ্ধমুখে, শান্ত-প্রসন্নমুখে, শান্তস্মিতমুখে, সলজ্জমুখে, স্মিতমুখে)। মূঢ় (ধর্মমূঢ়তা, ধর্মমূঢ়বুদ্ধি, বিজ্ঞানমূঢ়, সন্তরণমূঢ়)। মোচন (অপরাধ মোচন, কৃশতামোচন, সন্দেহমোচন)। যোগে (অবশ্য-যোগে, ইণ্ডিয়া আপিস যোগে, প্রীতিযোগে, বন্ধুরযোগে) যোগ্য (অনুবাদযোগ্য, অনুভব-যোগ্য, অনুসন্ধানযোগ্য, অবহেলাযোগ্য, অভিনয়যোগ্য, আনুকূল্যযোগ্য, কৃষিযোগ্য, খ্যাতিযোগ্য, ধারণাযোগ্য, নববধূযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, প্রকাশযোগ্য, প্রতিবাদযোগ্য, প্রত্যয়যোগ্য, প্রাপ্তিযোগ্য, বিবাহযোগ্য, বিস্মরণযোগ্য, লঙ্ঘনযোগ্য, সংগ্রহযোগ্য, সংজ্ঞা-নির্দেশযোগ্য, সঞ্চয়যোগ্য, সমযোগ্য, স্পর্শযোগ্য)। রক্ত (রাগরক্ত, রুদ্ররক্ত, রোষরক্ত)। রচিত (ভাগ্যরচিত, সমাজরচিত)। রস (অখণ্ডরস, ঐতিহাসিকরস, কলারস, গীতরস, বাল্যরস, বিস্ময়রস, মানবরস, সমগ্ররস)। রাজক (আত্মরাজকতা, ছন্দরাজকতা, পুলিশ-রাজকতা, বৈশ্বরাজকতা, পুলিশরাজকতা, ভৃত্যরাজকতন্ত্র, স্বরাজকতা); রাজ্য (অর্থরাজ্য, কল্পরাজ্য, গীতরাজ্য, গৃহরাজ্য, চেতনারাজ্য, ছায়ারাজ্য, বস্তুরাজ্য, বিষয়রাজ্য, বিশ্বরাজ্য, স্বপ্নরাজ্য)। রিক্ত (অন্নরিক্তা, গ্রীষ্মরিক্ত, তরুরিক্ত, দয়ারিক্ত, পুষ্পরিক্ত, বর্ষণরিক্ত, বৃষ্টিরিক্ত, শরীররিক্ত, শীতরিক্ত, সঙ্গীরিক্ত)। রূপে (আনুসঙ্গিকরূপে, চিত্তাকর্ষকরূপে, প্রাণবৎরূপে, বিশ্বজননীরূপে, বৃহৎরূপে)। লক্ষ্মী (আশ্রমলক্ষ্মী, কমলাক্ষ্মী, কল্যাণলক্ষ্মী, জগৎলক্ষ্মী, নির্জনলক্ষ্মী, প্রাচীলক্ষ্মী, প্রাণলক্ষ্মী, বণিক্লক্ষ্মী, বনলক্ষ্মী, বিশ্বলক্ষ্মী, বোটলক্ষ্মী, ভাবলক্ষ্মী, ভারতলক্ষ্মী, শুভালক্ষ্মী, সভালক্ষ্মী, সমাজলক্ষ্মী, সম্মানলক্ষ্মী, সাহিত্যলক্ষ্মী, স্বদেশ-লক্ষ্মী, হৃদয়লক্ষ্মী)। লোক (অন্তরলোক, অমর্ত্যলোক, আত্মলোক, উৎসবলোক, কল্পলোক, কাম্যলোক, চিত্তলোক, পদ্মলোক, প্রাণলোক, বিশ্বলোক, বিস্মৃতিলোক, মননলোক, মনোলোক, রহস্যলোক, সাহিত্যলোক)। শক্তি (চিত্তশক্তি, মননশক্তি, মননাশক্তি)। শক্কিল (মরণশক্কিল)। শয়ন (কুসুমশয়ন, গোলাপশয়ন, ধূলিশয়ন, পল্লবশয়ন)। শরণ

(অচলশরণ, অনন্যশরণ)। শায়ী (উত্তানশায়ী, চরণশায়ী, দূরদূরান্তশায়ী, ধূলিশায়ী, পরাবসথশায়ী, মরুশয্যাশায়ী, মৃত্যুবেদীতলশায়ী)। শাল (রঙ্গশাল)। শালা (অতিথি-শালা, অধ্যয়নশালা, কর্মশালা, কারুশালা, কীটশালা, কেরাণিশালা, গীতশালা, ছাত্রশালা, দণ্ডশালা, দাসীশালা, ধাত্রীশালা, নিমন্ত্রণশালা, নির্মাণশালা, পরীক্ষাশালা, পশুশালা, প্রবন্ধশালা, প্রমোদশালা, প্রহরীশালা, প্রেক্ষাশালা, বিচারশালা, বিলাসশালা, বিশ্রামশালা, ভিক্ষুশালা, ভৃত্যশালা, ভোজনশালা, মাতৃশালা, মৃত্যুশালা, রঙ্গশালা, রচনাশালা, শয়ন-শালা, শিক্ষাশালা, সংগীতশালা, সৃষ্টিশালা, স্থাপত্যশালা, স্নানশালা)। শালী (ক্রিয়াশালী, জয়শালী, প্রবলকণ্ঠশালী, সত্যশালী, সম্পৎশালী, গৌরবশালিনী, চন্দ্রমশালিনী, জীবনী-শালিনী, দীপশালিনী, প্রবাহশালিনী, মাতৃহৃদয়শালিনী, সর্বগুণশালিনী, স্নেহশালিনী) শিরে (বিনম্রনতশিরে)। শিল্পী (মূর্তিশিল্পী, রূপশিল্পী)। শীল (উৎপাটনশীল, উত্তেজনাশীল, উল্লম্ফশীল, কার্যশীল, গতিশীল, চলনশীল, চিরগঠনশীল, জয়শীল, তটগঠনশীল, মননশীল, রক্ষণশীল, সরণশীল, সাধনশীল, স্থিতিশীল, কৌতুকশীলা, দুঃখশীলা, নর্তনশীলা, শ্রমশীলা)। শূন্য (অত্যুক্তিশূন্য, আসক্তিশূন্য, কর্মশূন্য, চালশূন্য, তরুশূন্য, সীমাশূন্য)। সংকট (অন্নসংকট, অর্থসংকট, চিন্তাসংকট, পথসংকট, পর্বতসংকট, শাখাসংকট, সংসারপথসংকট)। সংকুল (আবর্তসংকুল, কণ্টকসংকুল, কর্মসংকুল, দাড়িগোঁফসংকুল, বহুজাতিসংকুল, বহুতীক্ষ্ণদৃষ্টি-সংকুল, বহুনায়কসংকুল, বাধাসংকুল, বিচিত্রকর্ণসংকুল, ব্যবধানসংকুল, ভয়সংকুল, ভ্রমসংকুল, মৃত্যুসংকুল, মৃত্যুবীজসংকুল, শক্তিসংকুল, সংকটসংকুলসংসার, সম্বন্ধসংকুল, ধর্মসংকুল)। সংগ্রাম (মানবসংগ্রাম)। সংঘ (জনসংঘ, প্রজাপতিসংঘ, বিশ্বজাতিসংঘ, মনুষ্যসংঘ, রাষ্ট্রসংঘ, সুরসংঘ)। সংসার (কর্মসংসার, জগৎসংসার, দাম্পত্যসংসার, প্রাণীসংসার, বহিঃসংসার, বিশ্বসংসার, ভবসংসার, মানবসংসার, সাহিত্যসংসার)। সঞ্চার (সুখসঞ্চার, স্বাস্থ্যসঞ্চার), সত্য (আদিমসত্য, পরিণামসত্য, বিশ্বসত্য)। সমাজ (পাঠকসমাজ, পুরুষসমাজ, বিশ্বসমাজ, বীরসমাজ, ভাবুকসমাজ, শিষ্টসমাজ)। সম্মিলন (আনন্দসম্মিলন, চিত্তসম্মিলন, দেবতা-সম্মিলন, বাঞ্ছিতসম্মিলন, স্বামিসম্মিলন)। সহায়ে (দৈবসহায়ে, বন্ধুসহায়ে)। সাধন (অকাব্যসাধন, আনন্দসাধন, আবশ্যকসাধন, আরোগ্যসাধন, ইচ্ছাসাধান, উৎসাহসাধন, ঐক্যসাধন, কল্যাণসাধন, জয়সাধন, তপঃসাধন, দৌত্যসাধন, পরিচয়সাধন, পরিণতিসাধন, পরিবর্তনসাধন, পূর্ণতাসাধন, প্রয়োজনসাধন, ব্যাপকতাসাধন, ব্যাপ্তিসাধন, ভিন্নতাসাধন, মননসাধন, মৌনসাধন, শিক্ষাসাধনব্যাপার, সন্তোষসাধন, স্ফূর্তিসাধন, স্বর্গসাধন, স্বার্থসাধন, হিতসাধন)। সাধ্য (অভিজ্ঞতাসাধ্য, অভ্যাসসাধ্য, আয়াসসাধ্য, কার্যসাধ্য, কালসাধ্য, কৌশলসাধ্য, ক্লেশসাধ্য, ক্ষমতাসাধ্য, চিন্তাসাধ্য, চেষ্টাসাধ্য, ত্যাগসাধ্য, দুঃখসাধ্য, ধনসাধ্য, ধৈর্যসাধ্য, নিষ্ঠাসাধ্য, প্রতিভাসাধ্য, বর্ণনাসাধ্য, বলসাধ্য, বিচারসাধ্য, বীর্যসাধ্য, যত্নসাধ্য, শক্তিসাধ্য, শুশ্রূষাসাধ্য, শ্রমসাধ্য, সত্যসাধ্য, সময়সাধ্য, স্বভাবসাধ্য, স্বল্পচেষ্টাসাধ্য)। সার (কথাসার, চর্মসার, প্রাণসার, ভস্মসার, শাখাসার, বজ্রসারবৎ, স্নেহসার)। সিদ্ধ (প্রকৃতি-সিদ্ধ, প্রথাসিদ্ধ, শাস্ত্রসিদ্ধ)। সুন্দর (অসীমসুন্দর, উজ্জ্বলসুন্দর, কোমলসুন্দর, ক্ষমাসুন্দর,

নিখুঁতসুন্দর, প্রসন্নসুন্দর, বিচিত্রসুন্দর, মহাসুন্দর, শান্তসুন্দর, শুচিসুন্দর, শ্যামলসুন্দর, সত্যসুন্দর, সৌম্যসুন্দর, স্নিগ্ধসুন্দর)। স্থ (অন্তরস্থ, দলস্থ, দূরস্থ, সমাজস্থ, সম্প্রদায়স্থ, সুদূরস্থ, স্বপ্রকৃতিস্থ, স্বর্গস্থ, হৃদয়স্থ)। স্থল (প্রতিষ্ঠাস্থল, প্রেরণাস্থল, রণস্থল, বিহারস্থল, ভোজনস্থল, রঙ্গস্থল)। স্থলী (অঙ্কস্থলী, কাননস্থলী, বনস্থলী, মরুস্থলী, রঙ্গস্থলী, শস্যস্থলী)। স্থান (ভোজনস্থান, স্থাপন (সভাস্থাপন)। স্থিতি (আত্মস্থিতি, কৃষিস্থিতিমূলক, লোকস্থিতি, সংসারস্থিতি, সমাজস্থিতি)। স্বভাব (তেজস্বীস্বভাব, ভক্তস্বভাব, ভীরুস্বভাব, মনোহরস্বভাব, লুব্ধস্বভাব)। স্বরূপ (অকালস্বরূপ, অঙ্গস্বরূপ, ইচ্ছাস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ, উৎপাতস্বরূপ, উপায়স্বরূপ, কবরস্বরূপ, কৌশলস্বরূপ, ধীস্বরূপ, নিয়মস্বরূপ, প্রতিশব্দস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, বলস্বরূপ, ভারস্বরূপ, মজ্জাস্বরূপ, মুক্তস্বরূপ, রসস্বরূপ, শান্তস্বরূপ, শিবস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সহায়স্বরূপ)। স্বরূপে (অনুবৃত্তিস্বরূপে, কর্তব্যস্বরূপে, ভারস্বরূপে, ভিত্তিস্বরূপে, শাখাস্বরূপে, স্বদেশবলিস্বরূপে)। স্বরে (অলসস্বরে, অশ্রুজড়িতস্বরে, অসন্দিগ্ধস্বরে, উদ্ধতস্বরে, ঊর্ধ্বস্বরে, কম্পিতস্বরে, চীৎকারস্বরে, তর্জনস্বরে, তীব্রমধুরস্বরে, দৃঢ়স্বরে নম্রমৃদুস্বরে, বজ্রস্বরে, ব্যগ্রস্বরে, রোষগর্জিত-স্বরে, শান্তগম্ভীরস্বরে, শান্তনম্রস্বরে, সজলস্বরে, সমুচ্চস্বরে, স্নেহস্বরে)। হত (নিমেষহত, বাক্যহত, ভাগ্যহত, লজ্জাহত)। হরণ (কলুষহরণ, তাপহরণ, তৃষাহরণ, ভয়হরণ, মনোহরণ, মরণহরণ, লজ্জাহরণ, শঙ্কাহরণ, শ্রান্তিহরণ, হৃদয়হরণ)। হরণী (তন্দ্রাহরণী, হৃদয়হরণী)। হরা (ক্ষুধাহরা)। হস্তে (প্রমাণরিক্তহস্তে)। হারা (আনন্দহারা, আলোহারা, উদ্দেশ্যহারা, কর্মহারা, কলসহারা, কর্মহারা, কালহারা, কূলহারা, ক্লান্তিহারা, খেয়াতরীহারা, ঘুমহারা, চিহ্নহারা, তন্দ্রাহারা, তীর্থহারা, দীপহারা, নামহারা, নিদ্রাহারা, নিমেষহারা, নিয়মবন্ধহারা, পিপাসাহারা, বচনহারা, বন্ধহারা, বাক্যহারা, বাঁধনহারা, বাধাবন্ধহারা, বিদ্যাহারা, বিরামহারা, বৃষ্টিহারা, ভাষাহারা, সময়হারা, সীমানাহারা)। হারী (তমোহারী, তাপহারী, দুঃখহারী, ভয়হারী, লক্ষ্মীহারী, শ্রান্তিহারী)। হাস্যে (অবরুদ্ধহাস্যে, লজ্জিতহাস্যে, সকটাক্ষহাস্যে, স্নেহকোমলহাস্যে, স্মিতহাস্যে)। হীন (আশাহীন, ইচ্ছাহীন, চন্দ্রোদয়হীন, চেষ্টাহীন, চেষ্টালক্ষণহীন, তপনহীন, ত্বরাহীন, দেহহীন, নাথহীন, পন্থহীন, প্রমাণহীন, বন্ধহীন, বাধাবন্ধহীন, ভর্তৃহীন, সংশয়হীন, বিশ্বাসহীনা)। হৃদয়ে (ক্লিষ্টহৃদয়ে, ব্যগ্রহৃদয়ে)।

উপরের তালিকায় যেমন পরপদরূপে ব্যবহৃত বিশেষ কতকগুলো শব্দ রবীন্দ্র-ব্যবহৃত শব্দে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ ও অব্যয় দেখতে পাওয়া যায়। এই অব্যয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি আবার উপসর্গ। রবীন্দ্র-ব্যবহৃত শব্দে এই উপসর্গ কয়টি কখনো-বা উপসর্গরূপে কখনো-বা শুধুই অব্যয়রূপে ব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথ উপসর্গকে prefix-এর সামিল গণ্য করেছেন।[৪]

৪ উপসর্গ-সমালোচনা, ১২।৫৫১

পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত রবীন্দ্র-শব্দতালিকা—

(নঞ্) অ। অকবি, অকর্তৃক, অকর্মকর্তা, অকলুষা, অকাব্য, অকারী, অকাল্পনিক, অকিঞ্চনতা, অকৃতকীর্তি, অকৃতবেশা, অকৃতিত্ব, অকৃষ্ট, অকৌলীন্য, অক্ষুব্ধ, অখ্রীষ্ট, অখ্রীষ্টান, অচঞ্চলা, অচিরকাল, অচিরকালীন, অচিরজাত, অচিরপ্রাচীনতা, অচিরায়ু, অচিহ্নিত, অচেত, অচেনতা, অচেতনা, অচ্ছায়, অছন্দ, অতথ্য, অতন্দ্রিত, অদীপ্ত, অদূরদর্শিতা, অদৃঢ়, অদেহ, অধনী, অপরিমিতি, অনিঃশেষ, অনিদ্র, অনিবারিত, অনিবেদিত, অনিমন্ত্রণ, অপঠিত, অপণ্ডিত, অপথ, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিপাট্য, অপরিশ্রান্তভাবে, অপরিস্ফুট, অপরিস্ফুরণ, অপরীক্ষিত, অপ্রকাশ্যতা, অপ্রজ্বল, অপ্রজ্বলিত, অপ্রতিপন্ন, অপ্রতিহার্য, অপ্রবুদ্ধ, অপ্রমত্ততা, অপ্রমাণ, অপ্রমাদ, অপ্রতিহতগামিনী, অপ্রাকৃতিক, অপ্রাপণা, অপ্রাপ্যতা, অপ্রামাণিক, অপ্রামাণ্য, অপ্রার্থিত, অপ্রিয়তা, অপ্রেম, অপ্রেমিক, অফলিত, অবঞ্চকস্বভাব, অবন্ধ, অবন্ধন, অবন্ধু, অবর্ষিত, অবল, অবাক্য, অবাধিত, অবায়ুস্পর্শ্যদেহ, অবারণ, অবাস্তবিক, অবিচার পরায়ণ, অবিচারিণী, অবিচিত্র, অবিতর্ক, অবিনাশী, অবিবেক, অবিবেকী, অবিরুদ্ধ, অবিরোধ, অবিশেষ, অবিশ্লিষ্ট, অবিশ্লেষ্য, অবুদ্ধি, অবেগ, অবৈদিক, অব্যক্তিক, অব্যতিরিক্ত, অব্যবধান, অব্যবহার, অব্যাকুল, অব্যাঘাত, অভাগ্য, অভাবাত্মক, অভাবার্থক, অভাব্য, অভাষা, অভুগ্ন, অভুল, অভূত, অভূষিত, অভৌতিক, অপ্রাপ্তিকতা, অমনোযোগিতা, অমানবিক, অমানী, অমানুষতা, অমিতভাষণ, অমিত্র, অমিষ্ট, অমূলকতা, অযথার্থতা, অযথাস্থান, অযুক্ত, অযুধ্যমান, অরক্ষা, অরক্ষিত, অরোচিত, অরব, অরুগ্ণ, অরুচিকর, অরেখ, অরেখা, অরোগ, অরোগী, অলক্ষণমত, অলক্ষ্যত, অলজ্যা, অলজ্জ, অলজ্জতা, অলোভ, অশঙ্কিত, অশঙ্কিনী, অশব্দ, অশব্দিত, অশরীর, অশিব, অশিষ্টতা, অশুচিকর, অশুভকর, অশুভাগমন, অশোক, অশ্রদ্ধাকর, অশ্রদ্ধাপরায়ণ, অশ্রদ্ধাবান, অশ্রদ্ধাভাজন, অশ্রদ্ধিত, অশ্রদ্ধেয়তা, অশ্রম, অশ্রুতিগম্য, অসংকুচিত, অসংবৃতা, অসংবৃতি, অসংযমিত, অসংশয়িত, অসংশয়তা অসংস্কৃতা, অসজ্জা, অসজ্জিত, অসজ্জিতা, অসৎপরামর্শ, অসতীত্ব, অসত্যপরতা, অসত্যপাশ, অসত্যপ্রায়, অসমকক্ষ, অসমকক্ষতা, অসমবয়সী, অসময়োচিত, অসমানতা, অসমাপ্তি, অসম্বদ্ধ, অসম্বদ্ধতা, অসম্ভাবিত, অসম্মাননা, অসম্মিলন, অসরল, অসরলতা, অসহকার, অসাজানো অসাধিত, অসাময়িক, অসিদ্ধ, অসীমায়নতা, অসুখকর, অসুবিধাকর, অসৃষ্ট, অসৈনিক, অসৌজন্য, অস্খলিত, অস্থিতি, অস্থূল, অস্পষ্টত, অস্ফুটিত, অস্বাদিত, অস্বাস্থ্যকর, অহিংসক, অহিংস্র, অহিংস্রক, অহিতকর, অহেতুকতা। অকাল— অকাল-অপক্ব, অকালজাগ্রত, অকাললজ্জা, অকালস্বরূপ। অচল— অচলপ্রায়, অচলশরণ। অজ্ঞাত— অজ্ঞাতচারী, অজ্ঞাতস্বভাব। অটল—অটলনির্ভর অটলনিষ্ঠ। অতি— অতিআধুনিক, অতি-ইচ্ছা, অতিকরণ, অতিক্ষণিক, অতিচির, অতিচেতন, অতিচেতনা, অতিচৈতন্যলোক, অতিদূরবিসর্পিত, অতিনিখুঁত,

অতিনিবিড়, অতিনীল, অতিনীলিম, অতিনেশনত্ব, অতিপরমাণু, অতিপরিচিত, অতিপ্রকাশিত, অতিপ্রত্যক্ষ, অতিপ্রাকৃত, অতিপ্রাচুর্য, অতিবদ্ধমূল, অতিবন্ধুরতা, অতিবর্তী, অতিবর্ষা, অতিবিশেষ, অতিবিশ্বাস, অতিবেদনাশীতল। অতিব্যগ্রতা, অতিব্যয়িতা, অতিভাষা, অতিভূষণ, অতিভূষিতা, অতিভোগ, অতিভোগী, অতিমিতি, অতিমিষ্ট, অতিলজ্জা, অতিললিত, অতিলালিত, অতিশ্রম, অতিসভ্যতা, অতিসমীচীন, অতিসৌষম্য, অতিস্ফুট, অত্যলংকৃত, অত্যাকাঙ্ক্ষা, অত্যুগ্রতা, অত্যুগ্রভাবে, অত্যুচ্চ-আদর্শওয়ালা, অত্যুজ্জ্বলতা, অত্যুৎকট, অত্যুৎসাহিক, অত্যুৎসাহী, অত্যুদ্ধত। অনতি (নঞ)— অনতি-আবশ্যক, অনতি-পল্লবিতা, অনতিবন্ধু, অনতিভূষিত, অনতিযৌবনা, অনতিরূঢ়, অনতিলক্ষ্য, অনতিসভ্য, অনতিস্ফুট। অন্— অনঙ্কুরিত, অনধিকারী, অনধিগম্য, অননুসরণীয়, অনন্যতন্ত্র, অনন্যতন্ত্রতা, অনন্যতন্ত্রত্ব, অনন্যনিষ্ঠ, অনন্যপরায়ণ, অনন্যযোগিতা, অনন্যশরণ, অনন্যশাসনা, অনপেক্ষিত, অনবকাশ, অনবচ্ছিন্ন, অনবরুদ্ধ, অনবশেষ, অনবসর, অনভিমত, অনভিমানী, অনভিরুচি, অনশ্বরা, অনম্র, অনর্থকতা, অনর্থকর, অনশ্বর, অনসম্ভবতা, অনাগমন, অনাগারিক, অনাচরণীয়, অনাদিষ্ট, অনাবরণ, অনাবিশ্ব, অনামা, অনায়সতা, অনালোক, অনালোকিত। অনাস্থা, অনীশ্বর, অনুৎপাদক, অনুত্তরঙ্গ, অনুত্তরণীয়, অনুদ্গত, অনুদ্ঘাটিত, অনুপলব্ধ, অনৈতিহাসিক, অনৈমিত্তিক, অনৌদার্য। অনু— অনুকম্পন, অনুকল্পনা, অনুকৃতি, অনুজীবী, অনুদেশ, অনুধাবন, অনুধাবনা, অনুধাবিত, অনুপন্থী, অনুপ্রকাশিত, অনুপ্রাণন, অনুবর্তনা, অনুবাদিত, অনুবেদনা, অনুমৃতা, অনুযাত্রী, অনুশাসন, অনুশীলনা, অনুশোচন, অনুষঙ্গ, অনুসঙ্গী। অন্তঃ—অন্তঃকর্ণ, অন্তঃকুহর, অন্তঃকেন্দ্র, অন্তঃপ্রকৃতি, অন্তঃশীল, অন্তঃশীলা, অন্তঃশূন্য, অন্তঃসার, অন্তঃস্তর, অন্তঃস্মিত। অন্তর—অন্তরতর, অন্তরতম, অন্তরবিদারণ, অন্তরবীণা, অন্তররুদ্ধ, অন্তরশয্যা, অন্তরস্থ, অন্তরাচ্ছাদন, অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, অন্তরিন্দ্রিয়। অন্তঃ—অন্তর্গামী, অন্তর্গূঢ়, অন্তর্জগৎ, অন্তর্জীবন, অন্তর্দংশ, অন্তর্দেবতা, অন্তর্দেশবাসী, অন্তর্নিবিষ্ট, অন্তর্বর্তী, অন্তর্বিষয়ী, অন্তর্বেদনা, অন্তর্ব্যথা, অন্তর্মনস্ক, অন্তর্মুখী, অন্তর্লব্ধ, অন্তশ্চর, অন্তশ্চল। অপ—অপকীর্তন, অপগমন, অপজনন, অপদৃষ্টি, অপদেব, অপদেবতা, অপভাষা, অপভ্রংশভা, অপসঞ্চয়, অপহৃত, অপসৃত। অব—অবকীর্ণ, অবচেতন, অবচেতনা, অবজনন, অবতত, অবধৌতিক, অবনম্র, অবমর্দিত, অবলুণ্ঠন, অবলুপ্ত, অবলেপন, অবাসিত, অবসাদক। অবশ্য—অবশ্যকৃত্য, অবশ্য-প্রতিপাল্য, অবশ্যবাধ্যতা, অবশ্যম্ভব, অবশ্যযোগ, অবশ্যরূঢ়তা, অবশ্যশিক্ষা। অভি—অভিক্রম, অভিজ্ঞাত, অভিতপ্ত, অভিদেশ, অভিনিয়ন, অভিনির্দেশ, অভিবন্দনা, অভিবর্তন, অভিব্যঞ্জমান, অভিনব, অভিযোক্তা, অভিলষিত, অভিষেচন, অভিসংযোগ, অভিসারিণী, অভিহত, অভ্যাঘাত, অভ্যুৎপাত, অভ্যুদয়, অভ্যুদিত। আ—আকম্পিত, আকৃষ্টিপরতা, আগামিক, আতপ্ত, আতাম্র, আধূলিলম্বিত, আনতাঙ্গী, আনমিত,

আনম্র, আনীল, আবরিত, আবৃতি, আভাষণ, আভাসন, আমন্থর, আমীলিত আমুলত, আয়তি, আরক্তিম, আলজ্জ, আলজ্জতা, আলজ্জিত, আলম্বিত, আলোল। আত্ম—আত্ম-অপকার, আত্ম-অবিশ্বাস, আত্ম-অভিজ্ঞতা, আত্ম-অস্বীকার, আত্ম-উপহাস, আত্ম-কেন্দ্রিত, আত্মখণ্ডন, আত্মগত, আত্মঘাত, আত্মঘাতক, আত্মঘাতী, (আত্মঘাতিনী) আত্মঘোষণা, আত্মচেতনা, আত্মজীবন, আত্মজৈবনিক, আত্মত্যাগচর্চা, আত্মত্যাগ-পরায়ণ, আত্মদাহী, আত্মনিবেদনপর, আত্মনির্ভরপর, আত্মপরায়ণ, আত্মপরিচয়, আত্মপরিবর্ধনা, আত্মপীড়ক, আত্মপ্রকৃতি, আত্মপ্রতিবাদ, আত্মপ্রতিবাদ, আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মপ্রবর্তনা, আত্মবিরোধ, আত্মবিলাস, আত্মবিহারী, আত্মবিসর্জন-পর, আত্মবিসর্জী, আত্মরক্ষাঘটিত, আত্মরচিত, আত্মরাজকতা, আত্মরূপ, আত্মসংবৃত, আত্মসংশয়ী, আত্মসমাধন, আত্মসহায়তা আত্মসার্থকতা আত্মসুখতৃপ্তি, আত্মসুখপরায়ণ, আত্মসৃজনপদ্ধতি, আত্মস্তুতি, আত্মহত্যাপরায়ণ, আত্মহনন, আত্মহিত। ইচ্ছা—ইচ্ছাঅনন্দময়, ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, ইচ্ছানুগত, ইচ্ছান্ধতা, ইচ্ছাবধিরতা, ইচ্ছাবল, ইচ্ছাবাদ, ইচ্ছামতে, ইচ্ছায়ত্ত, ইচ্ছাসংযম, ইচ্ছাসাধন, ইচ্ছাস্বরূপ, ইচ্ছাহীন। উৎ—উৎকর্ণ, উৎকর্ষবান, উৎকৃষ্টি, উৎপাটনশীল, উৎপাতক, উৎপুর্ণ, উৎশিষ্ট, উৎশেষ, উৎসর্জন, উৎসাদন, উৎসারিত, উৎসৃষ্ট, উৎস্রাবিয়া, উত্তত, উদ্‌গিরিত, উদ্‌গাথা, উদ্‌গীত, উদ্‌ঘোষণ, উদ্‌ঘোষিত, উদ্‌বারি, উদ্‌বারিত, উদ্‌বারিয়া, উদ্‌বারিল, উদ্‌বাহন, উদ্‌বাহিত, উদ্‌ভাষণ, উদ্‌ভাষিত, উদ্‌ভাসমান, উন্নমিত (উন্নমিতা), উন্মন্থন, উন্মথিত, উন্মুখর, উন্মুখী। উত্তর—উত্তরকাল, উত্তরচ্ছদ, উত্তরগামী, উত্তরতর, উত্তরবংশীয়, উত্তরবর্তী, উত্তরার্ধ। উদার—উদার-উদাসীন, উদার-গাম্ভীর্য, উদারনির্মল, উদারবিস্তীর্ণ, উদারশান্তি। উপ—উপগ্রাম, উপচেতন, উপজগৎ, উপজাতি, উপদেবলোক, উপদেবী, উপনায়ক, উপনিপাত, উপনিবেশী, উপপ্লব, উপরাজ, উপরোধ, উপস্বর্গ, উপাচার্য। এক—এককক্ষবর্তী, একগৃহবর্তী, একচক্ষুলণ্ঠন, একচেতনাসূত্র, একজাতিত্ব, একজাতীয়, একঝোঁকা, একতন্ত্র, একতানতা, একদেশীয়, একনায়ক, একনায়কতা, একনায়কত্ব, একপথবর্তী, একপতিনিষ্ঠ, একপত্নীনিষ্ঠ, একপরায়ণ, (একপরায়ণা), একপ্রবণতা, একবিরহিত, একমতবর্তী, একভাবাত্মক, একভিতে, একমাত্রিক, একরত, একরাষ্ট্রশাসন, একরোখ, একশেষ, একাঙ্গীকৃত, একাত্মকতা, একাত্মিকতা, একেশ্বররাজত্ব। একান্ত—একান্তচিত্তে, একান্তনিষ্ঠুর, একান্নবর্তিতা (একান্নবর্তী), একান্তবাসী, কদ্ (কু)—কদাঘাত, কদাশয়তা, কদুৎসাহী, কু—কুকবি, কুকাব্য, কুগঠিত, কুতর্ক, কুদর্শনচক্র, কুদৃশ্য, কুদৃষ্টান্ত, কুপথ্যলোলুপ, কুপোষ্য, কুফলতা, কুব্যবস্থা, কুমন্ত্রী, কুযুক্তি, কুযোগ, কুলগ্ন, কুশিক্ষা, কুশ্রাব্য, কুসংবাদ, ক্ষণ—ক্ষণকাল, ক্ষণকালীন, ক্ষণচর, ক্ষণজীবী, (ক্ষণজীবনী), ক্ষণমুখরা, ক্ষণস্থায়িত্ব, চির—চিরউদ্যমশীল, চিরকালীন (চিরকালিনী), চিরগঠনশীল, চিরগম্যস্থান, চিরচরম, চিরচলমান, চিরজাগ্রত, চিরজীবনরস, চির-

দারিদ্র্য, চিরদীর্ঘায়মাণ, চিরদুঃখাভিতপ্ত, চিরধৈর্যময়ী, চিরনন্দন, চিরনিদর্শন-স্বরূপ, চিরপুত্রহীনা, চিরপ্রতীক্ষিত, চির-প্ররূঢ়, চিরপ্রসন্নতা, চিরমন্দার, চিরমৌনজাল, চিরসম্ভব, চিরসহিষ্ণু, চিরসুখিনী, চিরস্মরণগৃহ, চিরস্বপ্রকাশ, চিরাগত, চিরাভ্যস্তবৎ, চিরাভ্যাস। ছদ্ম— ছদ্মদীপ্তি, ছদ্মনামধারী, ছদ্মবেশীনাচ, ছদ্মব্যবহার, ছদ্মসাজ। জন্ম— জন্ম-অকর্মণ্য, জন্ম-একলা, জন্ম-গরিব, জন্মদরিদ্র, জন্মদাস। জাগ্রত— জাগ্রত-বিরাজিত, জাগ্রতশক্তিপূর্ণ, জাগ্রতসচেতন, জাগ্রতসাক্ষী, জাগ্রতস্বপ্ন। জাগ্রৎ—জাগ্রৎঅবস্থা, জাগ্রৎচিত্ত, জাগ্রৎচৈতন্য, জাগ্রৎসত্তা, জাগ্রৎস্বপ্ন। জাত—জাতবান্ধবী, জাতশত্রু, জাতসাপিনী। দুঃ—দুঃশব্দ, দুঃশীতল, দুঃশ্রাব্য, দুঃসমস্যা, দুঃসম্ভব, দুঃসম্ভাবনা, দুঃসাধ্যকর, দুঃসীম, দুঃস্মৃতি, দুরভিভব, দুরাকাঙ্ক্ষী, দুরাগম্য, দুরায়ত্ত, দুরাশ, দুর্ঘট, দুর্জেয়, দুর্দর্শ, দুর্দহন, দুর্দৃশ্য, দুর্নম্য, দুর্নিমিত্ত, দুর্বশ, দুর্বাধ্য, দুর্বাসনা, দুর্ভর, দুর্ভাষা, দুর্মন্ত্রণা, দুর্মানুষতা, দুর্মোচ্য, দুর্লক্ষ্য, দুর্লংঘ (-ঘ্য), দুর্ললিত, দুশ্চরিত, দুশ্চারিণী, দুষ্পরিমেয়। দূর—দূরকালবদ্ধ, দূরগামিতা, দূরগামিনী, দূরঙ্গমিত, দূরদূরান্তশায়ী, দূরদেশবাসী, দূরবর্তিনী, দূরবিহারী, দূরভবিষ্যৎবর্তী, দূরভাব, দূরমনস্কতা, দূরস্থ। দৃঢ়—দৃঢ়গম্ভীরভাবে, দৃঢ়তনিষ্ঠ, দৃঢ়নির্দিষ্ট, দৃঢ়নিবদ্ধ, দৃঢ়নিশ্চল, দৃঢ়নিষ্ঠ (দৃঢ়নিষ্ঠা), দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, দৃঢ়স্বরে। নি—নিকরুণ, নিকর্ষণ, নিখাত, নিচল, নিতল, নিলজ্জ, নিলাজ, নিলীন। নিঃ (নির্, নিষ্, নিশ্)—নিঃশক্তি, নিঃশঙ্ক, নিঃশত্রু, নিঃশর, নিঃশাস্তি, নিঃসংকট, নিঃসংসক্ত, নিঃসক্ত, নিঃসঙ্গিনী, নিঃসত্ত্ব, নিঃসন্ততি, নিঃসন্দিগ্ধ, নিঃসম্পর্ক, নিঃসরিক, নিঃসরিছে, নিঃসহ, নিঃসারণ, নিঃসাহস, নিঃসীম, নিঃসুর, নিঃসৃতি, নিঃস্পন্দ, নিঃস্যন্দিত, নিঃস্বত্ব, নিঃস্বন, নিঃস্বপ্ন, নিঃস্বর, নিরঙ্কিত, নিরঙ্কুর, নিরপত্য, নিরবকাশ, নিরবগুণ্ঠিত, নিরভিভূত, নিরভিমানচিত্তে, নিরলংকার, নিরশ্রু, নিরাকুল (নিরাকুলতা), নিরাকৃত, নিরাধার, নিরাপত্তি (নিরাপদ), নিরাপত্তে, নিরাবিল, নিরালয়, নিরালস্য, নিরালোক, নিরাশী, নিরাশ্বাস, নিরাসক্ত (নিরাসক্তি), নিরাসকর, নিরাহার, নিরুৎকণ্ঠিত, নিরুৎসুক, নিরুত্তর, নিরুদ্যোগী, নিরুদ্বিগ্ন, নিরুপায়, নিরৌৎসুক্য, নির্ঘোষণ, নির্জমিদার, নির্জিত, নির্জীবন, নির্ঝরিত, নির্ঝরী, নির্দেয়াল, নির্ধনী, নির্ধূম, নির্নিমিখ, নির্বন্ধ, নির্বল, নির্বস্তুক, নির্বাক্, নির্বাত, নির্বাধুনিক, নির্বাধ, নির্বারিত, নির্বিকল, নির্বিচল, নির্বিদার, নির্বিবেক, নির্বিবেচক, নির্বৃতি, নির্ব্যক্তিক, নির্ভূষণ, নির্ভেদ, নির্মশক, নির্মহাজন, নির্মানুষ, নির্মোহ, নির্লক্ষ্য, নির্লাজ, নিষ্কপট, নিষ্করুণ, নিষ্কর্মণ্য, নিষ্কর্ষণ, নিষ্কল, নিষ্কারণ, নিষ্কারুণ্য, নিষ্কার্পেট, নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কিস্ত, নিষ্খদ্দর, নিষ্পত্র, নিষ্পরোয়া, নিষ্প্রতিভ, নিশ্চঞ্চল, নিশ্চিঠি, নিশ্চেতন, নিশ্চেতনা, নিশ্চৈতন্য, নিশ্ছিদ্র, নিশ্ছিপি। নিত্য—নিত্য-অনুষ্ঠেয়, নিত্য-উপাসনা, নিত্যকালীন, নিত্যজাগ্রত, নিত্যদীপবিভাসিত, নিত্যধর্ম, নিত্যনিয়ত, নিত্যপ্রসাদ, নিত্যপ্রেম, নিত্যসংশয়িত, নিত্যসঞ্জীবিত, নিত্যসন্ধানপরতা, নিত্যসহাস্য, নিত্যস্বপ্নদর্শী। পর—পরজাত,

পরজাতি, পরজাতীয়, পরজীবী, পরতন্ত্র, পরতন্ত্রতা, পরতীর, পরদণ্ড, পরদাসত্ব, পরদেশীয়, পরপরায়ণতা, পরপ্রত্যাশী, পরভাষা, পররাজ, পররাজ্য, পরশক্তি, পরশিক্ষা, পরশ্রমজীবী, পরসংঘাত, পরসমাজ, পরহিতৈষা, পরানুসরণ, পরাবর্তন, পরাবসথশায়ী, পরাভিমুখ, পরাশিত, পরাশ্রিত, পরাসক্ত, পরোপচিকির্ষা। পরম—পরমজাগতিক, পরমদুঃখকর, পরমনিশ্চেষ্ট, পরমপ্রাণ, পরমপরিহসনীয়া, পরমব্যথিত, পরমমানবিক, পরমাত্মীয়, পরমানন্দ, পরমোৎসাহ। পরা—পরাকৃত, পরাবৃত্ত, পরামুক্তি, পরাশক্তি। পরি—পরিকীর্ণ, পরিক্রমণ, পরিক্ষত, পরিক্ষীণ, পরিদৃষ্ট, পরিপুঞ্জিত, পরিপুষ্টি, পরিপোষণহীন, পরিপ্রেক্ষণ, পরিপ্রেক্ষণিকা, পরিপ্রেক্ষণী, পরিপ্রেক্ষিত, পরিবিস্তৃত, পরিবৃদ্ধি, পরিবেষ্টিতা, পরিব্যক্ত, পরিভাষা, পরিভূষিত, পরিভ্রষ্ট, পরিভ্রান্ত, পরিমণ্ডলী, পরিমাপক, পরিরক্ষিত, পরিশান্ত, পরিশোধিত, পরিষক্ত, পরিস্করণ, পরিসূক্ষ্ম, পরিস্পৃষ্ট, পরিস্ফীত, পরিস্ফুটন, পরিস্ফূর্ত, পরিহরণ, পরিহর্তব্য। প্র—প্রকর্ষ, প্রকুপিত, প্রচ্ছায়, প্রজন, প্রজাতি, প্রজ্ঞপ্তি, প্রজ্বলন্ত, প্রজ্বলিত, প্রণোদনা, প্রতপ্ত, প্রদৌহিত্রী, প্রধাবিত, প্রধূমিত, প্রধ্মাপিত, প্রপৈত্রিক, প্রবৃদ্ধি, প্রভক্ষক, প্রমুক্ত, প্রমুগ্ধ, প্রমুদিত, প্রশান্তি, প্রশ্বসিত, প্রস্ফুট, প্রস্ফুরিত, প্রহত, প্রাগ্রসর, প্রোৎসাহক, প্রোল্লাস, প্রোল্লোল। প্রতি—প্রতিঋণ, প্রতিগ্রহ, প্রতিঘাতী, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিজিঘাংসা, প্রতিঝংকৃত, প্রতিনমস্কার, প্রতিপক্ষতা, প্রতিপণ, প্রতিপ্রহার, প্রতিবর্গ, প্রতিবর্তী, প্রতিবাক্য, প্রতিবাদক, প্রতিবাদী, প্রতিবেশ, প্রতিবোধবিদিত, প্রতিব্যূহ, প্রতিব্যূহিত, প্রতিভাষণ, প্রতিমুখ, প্রতিমুখী, প্রতিযুধ্যমান, প্রতিযোগী, প্রতিযোদ্ধা, প্রতিরোহী, প্রতিলাথি, প্রতিলাপ, প্রতিসংহরণ, প্রতিসংহার, প্রতিসংহৃত, প্রতিস্পর্ধী, প্রতিস্ফুরিত, প্রতিহাস্য, প্রত্যংশ, প্রত্যক্ষরীকরণ, প্রত্যনুবাদ, প্রত্যন্ত, প্রত্যভিঘাত, প্রত্যভিবাদন, প্রত্যাগতি, প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাসন্ন, প্রত্যাহরণ, প্রত্যুদ্গমন, প্রত্যুপহার, প্রতক্ষ—প্রত্যক্ষকারী, প্রত্যক্ষগামী, প্রত্যক্ষগোচর, প্রত্যক্ষবৎ, প্রত্যক্ষবর্তী, প্রত্যক্ষভাবে, প্রত্যক্ষসংসার। বহিঃ (বহির্, বহিষ্, বহিশ্)—বহিরংশ, বহিরঙ্গণ, বহিরভিমুখী, বহিরাশ্রয়িতা, বহিরাশ্রিত, বহিরিন্দ্রিয়, বহিরুৎপাত, বহির্গর্ভ, বহির্গমতা, বহির্গামী, বহির্ঘটনা, বহির্জগৎ, বহির্জীবন, বহির্দৃষ্টি, বহির্দ্বার, বহির্নয়ন, বহির্বর্তী, বহির্বিষয়, (বহির্বিষয়ী), বহির্ব্যঞ্জক, বহির্ভবন, বহির্ভুক্ত, বহির্মুক্ত; বহিস্করণ, বহিশ্চক্ষু, বহিশ্চ্যুতি। বহু—বহুকালীন, বহুগুণিত, বহুগুণীকৃত, বহুগ্রন্থিল, বহুচিন্তাজাল, বহুচেষ্টাগত, বহুজাতিসংকুল, বহুনায়কসংকুল, বহুপ্রসূ, বহুবাল্যকালে, বহুমাত্রিক, বহুমান, বহুমান্য, বহুরাজকতা, বহুশাখায়িত, বহুসংগ্রহী, বহ্বক্ষরক, বহ্বাশী বি—বিকম্পিত, বিকিরিত, বিক্ষত, বিক্ষেপ, বিক্ষোভিত, বিখণ্ডিত, বিঘট্টিত, বিঘূর্নন, বিঘূর্ণিত, বিচঞ্চল, বিচলন, বিচারণা, বিচেতন, বিতন্ত্রী, বিদলিত, বিদ্রাবণা, বিধর্ষিত, বিধার্মিক, বিধূনন, বিধূয়মান, বিধ্বংসন,

বিনষ্টি, বিনিঃসৃত, বিনিপাত, বিপ্রকর্ষণ, বিপ্লাবিত, বিবর্জন, বিবেশ, বিভঙ্গিত, বিমনা, বিমলিনা, বিমিশ্রিত, বিমুক্ত, বিমুদিত, বিমোচন, বিযুক্ত, বিলগ্ন, বিলুণ্ঠিত, বিলুপ্তি, বিলোল, বিশোচন, বিশ্রান্ত, বিশ্রামী, বিসর্পিত, বিস্ত্রীক, বিস্ফুরিত, বিস্ফুলিঙ্গ, বিস্ফোটক, বিস্ফোরণ, বিহসিত। বিশ্ব —বিশ্বঘাতী, বিশ্বচরাচর, বিশ্বজগৎ, বিশ্বজনীন, বিশ্বজাগতিক, বিশ্বজাতি, *বিশ্বজাতীয়তা, বিশ্বজীগিষু*, বিশ্বজীবন, বিশ্বতত্ত্ব, বিশ্বতন্ত্র, বিশ্বদিগ্‌বিজয়, বিশ্বদুরিত, বিশ্বধরণী, বিশ্বধরাতল, বিশ্বধরিত্রী, বিশ্বনিখিল, বিশ্বনিন্দুক, বিশ্বনীতি, বিশ্বনেশনত্ব, বিশ্বপালক, বিশ্বপাবন, বিশ্বপৃথিবী, বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্বপ্লাবিনা, বিশ্ববসুন্ধরা, বিশ্ব-বিদ্রোহ, বিশ্ববিধাতা, বিশ্ববিরহিত, বিশ্ববীণা, বিশ্বব্যাপিনী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বভুবন, বিশ্বভুবনেশ্বর, বিশ্বভূমি, বিশ্বভূমীন, বিশ্বভৌতিক, বিশ্বভৌমিক, বিশ্বমনা, বিশ্ব-মানব, বিশ্বমানবমন, বিশ্বমানুষ, বিশ্বমোহন, বিশ্বময়, বিশ্বরঙ্গভূমি, বিশ্বরাজ্যেশ্বর, বিশ্বলোক, বিশ্বশালা, বিশ্বসংসার, বিশ্বসমাজ, বিশ্বসাধারণ, বিশ্বসাহিত্য, বিশ্বাত্মা, বিশ্বান্তর, বিশ্বেশ্বর। বিশ্বাস—বিশ্বাসঘাত, বিশ্বাসঘাতী (বিশ্বাসঘাতিনী), বিশ্বাস-জনক, বিশ্বাসপরতা, বিশ্বাসপরায়ণ, বিশ্বাসপ্রবণ, বিশ্বাসবন্ধন, বিশ্বাসমুগ্ধতা, বিশ্বাসহীনা। বে—বেকবুল, বেখাপ, বেগানা, বেছন্দ, বেঠিকানা, বেদরকারি, বেদরদী, বেদল, বেদস্তুর, বেনামি, বেফাঁস, বেবন্দোবস্ত, বেমেয়াদি, বেমেরামত, বেমেরামতী, বেরকম, বেরঙা, বেলয়। মহৎ—মহৎ-অনিষ্ট, মহৎ-আর্ট, মহৎ-কর্তব্য, মহৎকর্ম, মহৎজীবন, মহৎতত্ত্ব, মহৎধর্মনিয়ম, মহৎবৃত্তি, মহৎব্যাপার, মহৎভাবে, মহৎ-মৃত্যুকারা, মহৎরূপ, মহৎলক্ষ্য, মহৎসংকল্প, মহৎসত্তা, মহৎ-সম্পদ, মহৎসার্থকতা, মহৎস্বরূপ, মহৎস্বার্থ, মহৎসান্ত্বনা, মহদ্‌দৃষ্টান্ত। মহা—মহা-অধিকার, মহা-অনুগ্রহ, মহা-অপরাধ, মহা-অপরিচিত, মহা-আঁধার, মহা-আহ্বান, মহাজনতা, মহানির্যাতন, মহানীরবতা, মহাবিরক্ত, মহাবেগে, মহাসুযোগ; মহাকর্ষ, মহাকাব্য, মহাকায়, মহাকাল, মহাকাশ, মহাক্ষেত্র, মহাগহ্বর, মহাগান, মহাগীত, মহাগ্রন্থ, মহাচ্ছায়া, মহাজনসভা, মহাজননী, মহাজাগতিক, মহাজাতি, মহাজাতিক, মহাজ্ঞাতি, মহাতপস্যা, মহাতান, মহাতাপস, মহাদিন, মহাদুঃখিনী, মহাদ্বীপ, মহাধনী, মহানদ, মহানদী, মহা-নিঃশব্দ, মহানিকেতন, মহানির্জন, মহানিষ্ক্রমন, মহান্ধকার, মহাপথ, মহাপরিণাম, মহাপাতকী, মহাপ্রাঙ্গণ, মহাপ্রাণী, মহাপ্রান্তর, মহাপ্লাবন, মহাপ্লাবী, মহা-ফ্রেডারিক, মহাবলী, মহাবিদ্বান, মহাবিনাশ, মহাবীনা, মহাবৃক্ষ, মহাব্যস্ত, মহাভীষণ, মহাভ্রম, মহামরণ, মহামহোৎসব, মহামানী, মহামানুষ, মহামোহ, মহাযজ্ঞ, মহাযোগ, মহারণ্য, মহারাজ্য, মহালোক, মহাশক্তি, মহাশান্তি, মহাশর্ধ, মহাসংগীত, মহাসংঘ, মহাসত্য, মহাসন, মহাসাক্ষ্য, মহাসাধনা, মহাসুন্দর, মহাসেতু, মহাস্নেহ, মহাস্রোত, মহেশ্বর, মহোচ্চ, মহোচ্চতা, মহোজ্জ্বল,

মহোত্তমা, মহোৎপাত, মহোদয়শালী, মহোন্নত, মহোপকারী। মায়া—মায়া-উপবন, মায়াকুমারী, মায়াজগৎ, মায়াতরী, মায়াতরু, মায়ানিশ্বাস, মায়াপ্রাসাদ, মায়াবাস, মায়ামরীচিকা, মায়ালতা, মায়াসেবিকা। যথা—যথাকাম, যথাপথ, যথাপরাধ, যথাপরিমিত, যথাপরিমিততা, যথাবুদ্ধি, যথামতো, যথাযথ্য, যথাযোগ্যতা, যথাযোগ্যভাবে, যথেচ্ছাঘটিত। রক্ত—রক্তকান্ত, রক্তকায়, রক্তচরণ, রক্তচক্ষু, রক্তনয়ন, রক্তনেত্র, রক্তপায়ে, রক্তমেঘ, রক্তরশ্মি, রক্তসমুদ্র। লোক—লোকখ্যাত, লোকচক্ষুপাত, লোকচমক, লোকপুজ্যতা, লোকপ্রবাহ, লোকবৎসলা, লোকব্যবহার, লোকশত্রু, লোকসংস্থানকার্য, লোকসঙ্গ, লোকসংঘ, লোকসাহায্য, লোকস্মৃতি, লোকস্থিতি, লোকহনন, লোকহিতপ্রবর্তক, লোকহিতব্রত। শূন্য—শূন্যআঁখি, শূন্যপ্রাণ, শূন্যমনা, শূন্যময়, শূন্যাত্মক। সং (সম)—সংকল্পন, সংকল্পনা, সংক্ষুব্ধ, সংক্ষোভ, সংনিবদ্ধ, সংবর্তন, সংবাদী, সংবেগ, সংবেষ্টন, সংমিশ্রিত, সংযমন, সংযমিত, সংরচিত, সংরাগ, সংরুদ্ধ, সংলালন, সংলিপ্ত, সংসক্ত, সংসাধন, সংস্থাপন, সঙ্কল, সমাকুল, সমায়ত্ত, সমালোচন, সমালোচ্য, সমাশ্রিত, সমাসন্ন, সমাহরণ, সমুচ্চ, সমুচ্ছল, সমুজ্জ্বল, সমুৎকর্ষ, সমুৎকৃষ্ট, সমুদার, সমুদিত, সমুদ্ধৃত, সমুপস্থিত, সম্ভাষণা, সম্ভোজন, সম্মিতি, সম্মিলন, সম্মিশ্রন, সম্মিশ্রিত। স—সকর্দম, সকারণ, সকারী, সকোণকাচখণ্ড, সক্রোধে, সগর্জন, সগর্ব, সগর্বস্মিত, সচরাচর, সজন, সতর্জন, সতিমির, সত্রাসে, সনিশ্বাস, সপরিজনে, সপাদুক, সপুলকে, সপ্রতিভ, সপ্রমাণ, সবস্ত্রে, সবিদ্রূপে, সবেগ, সবেদন, সভ্রূভঙ্গে, সমনস্ক, সমনোযোগে, সমূলক, সরূপ, সরোদন, সরোষ, সলজ্জে, সশব্দ, সশেষ, সশ্রেণীয়, সসংকোচ, সসংজ্ঞ, সসন্তান, সসম্ভ্রম, সহাস, সাক্রোশ, সাপেক্ষ, সাভিমান, সাস্থ্য। স—অতিশায়নে—সকম্পিত, সকরুণ, সকাতর, সকৃতজ্ঞ, সক্ষম, সচকিত, সচঞ্চল, সচল, সলজ্জিত, সশঙ্কিত। সদ্যঃ—সদ্যকর্ষণ, সদ্যঃপাতী, সদ্যপুষ্পিত, সদ্যঃপ্রকাশিত, সদ্যঃপ্রত্যাগত, সদ্যঃসঞ্চিত, সদ্যসিক্ত, সদ্যস্থাপিত, সদ্যোজাগ্রত। সম—সমকালবর্তী, সমকালীন, সমতলতা, সমতলীন, সমতুল্যতা, সমদ্বিভক্ত, সমপাত, সমবেদক, সমভাষা, সমভূম, সমভূমি, সমভ্যর্থন, সমমাত্রক, সমমাত্রিক, সমযোগ্য, সমরেখা, সমসূত্র, সমাংশভাগী, সমান্তর, সমোচ্চ। সর্ব—সর্বকালীন, সর্বগ, সর্বগত, সর্বজনগম্যতা, সর্বগামী, সর্বজগন্ময়, সর্বগ্রহ, সর্বগ্রাহী, সর্বজনীন, সর্বদর্শী, সর্বনাশী, সর্বপাবক, সর্বপ্রাধান্য, সর্বফলস্পৃহা, সর্বভুক্, সর্বমঙ্গলবাদী, সর্বময়, সর্বরিক্ত, সর্বলভ্য, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বসংহারক, সর্বসম্পূর্ণ, সর্বসম্ভবা, সর্বসহিষ্ণু, সর্বাগ্রগণনীয়, সর্বাগ্রমনে, সর্বাঙ্গসচেতন, সর্বাঙ্গসম্পন্ন, সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বাশ্রয়। সহ—সহধর্ম, সহধর্মী, সহপাঠিকা, সহবর্তিনী, সহমরণ, সহযাত্রী, সহযাত্রিনী, সহযোগী (সহযোগিনী)। সু—সুকণ্ঠিনী, সুকবিতা, সুকাব্য, সুগতি, সুগম্ভীর, সুগোচর, সুগ্রহ, সুচিকন, সুচির, সুডৌলভাবে, সুদুর্গম, সুদুর্ভর, সুদুর্ভেদ্য, সুনন্দন, সুনম্র, সুপ্রশস্ত, সুবদনী, সুবাধ্য, সুবিচারিত, সুবিজন,

সুবিরল, সুবেশী, সুব্যক্ত, সুভদ্র, সুভিক্ষা, সুমঙ্গলধারা, সুমন্দ, সুমহত্তর, সুমহতী, সুমিতি, সুযুক্তিসঙ্গত, সুসংস্কারী। স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধ করুণ, স্নিগ্ধকোমল, স্নিগ্ধগম্ভীর, স্নিগ্ধনিঃশব্দ, স্নিগ্ধনিভৃত, স্নিগ্ধনির্মল, স্নিগ্ধসুন্দর। স্ব—স্বকাল, স্বজাতিক, স্বজাতীয়তা, স্বদৈহিক, স্বধর্মী, স্ববশ, স্ববিরোধী, স্ববুদ্ধিজীবী, স্বভাষী, স্বরচিত, স্বরাজী, স্বরাজ্য, স্বরূপত, স্বশ্রেণীয়, স্বসমুখ, স্বসাম্প্রদায়িক, স্বাক্ষরিত, স্বানুবর্তিতা, স্বাবর্তন, স্বাভিরুচি। স্বতঃ—স্বতঃউৎসারিত (স্বত-উৎসারিত), স্বতঃপ্রকাশ, স্বতঃপ্রবর্তনা, স্বতঃপ্রদত্ত, স্বস্বঃসক্রিয়, স্বতঃসঞ্চার, স্বতঃস্বীকার্য, স্বতশ্চাঞ্চল্য, স্বতশ্চালিত, স্বতোধাবিত, স্বতোবিরুদ্ধ (-তা), স্বতোবিরোধ, স্বতোবিরোধী (-ধিতা)। স্বভাব—স্বভাবচিত্র, স্বভাবনিঃশঙ্ক, স্বভাব-নিঃসৃত, স্বভাব পাপিষ্ঠ, স্বভাববন্ধু, স্বভাববিদ্রোহী, স্বভাববিশ্বাসী, স্বভাবভক্ত, স্বভাবশিথিল, স্বভাবশ্রোতা, স্বভাবসন্দিগ্ধ, স্বভাবসাধ্য, স্বভাবসুস্থ, স্বভাবসৌম্য। হঠাৎ—হঠাৎনবাব, হঠাৎবন্যা, হঠাৎরাজা, হঠাৎস্ফূর্ত। হত—হতচারিত্র, হতচেতন, হতজ্ঞান, হতজ্যোতি, হতপ্রাণ, হতবিধি, হতভাগ্য, হতমনোরথ, হতমান, হতলাজ, হতাদর, হতাশ্বাস, হতোৎসাহ।

মানসোল্লাসে বর্ণিত চর্যাগীতি

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদিতে চর্যাগানের উল্লেখ ও গায়নরীতির বর্ণনা আছে। এই উল্লেখ ও বর্ণনা থেকে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে একদা ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে চর্যাগানের প্রচলন ছিল এবং এরূপ অনুমানেরও কারণ আছে যে, চর্যাগীতি বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়। মূল প্রেরণা বাংলা থেকে পাওয়া গিয়েছিল এ কথা হয়তো সত্য হতে পারে, কিন্তু সংগীতগ্রন্থে এইরকম বিশেষ কোন উল্লেখ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল তদীয় মানসোল্লাস বা অভিলষিতার্থচিন্তামণি (১১২৯-৩০) নামক মহাগ্রন্থের বিনোদবিংশতি অধ্যায়ে সংগীত সম্বন্ধে উদাহরণসমেত ব্যাপক আলোচনা করেছেন। যে অংশে তিনি প্রবন্ধ-সংগীতের পরিচয় প্রদান করেছেন সেই অংশটি গীতবিনোদ নামে খ্যাত। মানসোল্লাসের সংগীতাংশ এই কারণে মূল্যবান যে বহু গানের পরিচয় নমুনা দিয়ে দেখানো হয়েছে— এর মধ্যে অনেকগুলি সোমেশ্বরের নিজের রচনা। চর্যাগানের প্রসঙ্গেও সোমেশ্বর একটি প্রাচীন চর্যার কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃতাংশটি বোধ করি চর্যাগীতির একটি নূতন সংযোজন বলে পরিগণিত হবে। দুঃখের বিষয় এই খণ্ডটির শুদ্ধ পাঠ পাওয়া সম্ভব হয় নি। Gaekwad Oriental Series (No 138)-এর মানসোল্লাস তৃতীয় ভাগ দুটি পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত— একটি ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল ইন্‌স্টিটিউটে (পুনা) রক্ষিত, অপরটি বিকানীর দরবার কর্তৃক অধিকৃত। এই দুটি পুঁথি সম্বন্ধে সম্পাদক বলেছেন, "Both of them are defective and full of scribal errors. The copyists could not decipher correctly the original manuscripts. Thus in these manuscripts there are mistakes of omissson, commision and wrong desiphering." —Preface, G. K. Shrigondekar. চর্যাগীতির যে উদাহরণটি এই মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া গেছে, তাতে প্রমাদ এত বেশি যে, নিপুণ ভাষাবিদ্ ব্যতীত অপরের পক্ষে এর যথার্থ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই কারণে এই উদ্ধৃত চর্যাখণ্ডটি পণ্ডিত-সমাজে স্থাপন করা হল দুটি উদ্দেশ্যে—একটি এর যথার্থ পাঠনির্ণয়, অপরটি সম্পূর্ণ চর্যাগীতির উদ্ধার।

চর্যাগীতি যোগী সম্প্রদায়ের গেয়। যোগীজনের প্রিয় গান সে সময় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সোমেশ্বর বলেছেন—

গূঢ়ার্থৈঃ পরমার্থৈশ্চ সংসারসুখদুঃখচৈঃ।
পদৈর্নিয়োজিতং গীতং সাধ্যাত্মং যোগিবল্লভম্ ॥

চর্যাগীতির লক্ষণ সম্বন্ধে সোমেশ্বর বলছেন—

অর্থশ্চাধ্যাত্মিকঃ প্রাসঃ পাদদ্বিতয় শোভনঃ।
উত্তরার্ধে ভবেদেবং চর্যা সা তু নিগদ্যতে॥

আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত পাদান্তে অনুপ্রাস সম্পন্ন প্রথমার্ধে দুটি বা তিনটি পাদ এবং উত্তরার্ধেও উক্তসংখ্যক পাদবিশিষ্ট গীতকে চর্যা বলা হয়।

এইটুকু বলে সোমেশ্বর একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিয়েছেন—

সংসারসারুদত্তরেং কায়রহিতেং চণ্ডিয়া।
কোহল্যেহমোহবহুকেন ভরিয়া।
ইন্দ্রাদিপবণথরবেণবহম্পি।
তুক্কিয়ল্যহরিহণি যতদ্রিতপাবধিঃ॥ ৫৮॥ (পৃ. ৫৭)

এই উদাহরণেরই আর একটি পাঠ দেওয়া হয়েছে উক্ত গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায়—

সংসারসোপুহদরৈঃ কায়হীনং চণ্ডিয়া।
কোহলোহমাহ বহুকেণ তরিয়া।
ইন্দিয়পয়ণ থরবেগেব হংসি।
তুত্তি হলাহণিম নড়িন চাপধি। ৩৮০॥

গ্রন্থকার সম্পূর্ণ চর্যাগীতিটি উদ্ধার করে দেন নি, দিলে ভণিতা পাওয়া যেত এবং পাঠোদ্ধারে আরও কিছু সাহায্য হত। এটি সম্ভবত পূর্বার্ধ। সংগীতের দিক থেকে অপর অংশটির কোন বিশেষত্ব নেই বলেই বোধ হয় সেটুকু বাহুল্যবোধে দেওয়া হয় নি। এইটুকু উদ্ধার করে তিনি বলেছেন :

ঈদৃক্ পদানি চত্বারি দর্শিতানি ময়াধুনা।
অধ্যাত্মকার্থযুক্তানি চর্যানাম্নি প্রবন্ধকে॥ ৩৮১॥ (পৃ. ৬৪)

অর্থাৎ, এখন এইরকম চারটি পদ প্রদর্শন করা হল। এইগুলি আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত চর্যানামক প্রবন্ধের অন্তর্গত।

কোন গীত কোন বিষয়ে প্রযোজ্য এ সম্বন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গে সোমেশ্বর বলছেন :

কথাসু ষট্‌পদী যোজ্যা বিবাহে ধবলস্তথা।
উৎসবে মঙ্গল গেয়শ্চর্যা যোগিজনৈস্তথা॥ ১৯৩॥ (পৃ. ৬০)॥ ৫৫২॥ (পৃ. ৮১)

কথা প্রসঙ্গে "ষট্‌পদী" নামক গীত যোজনা করা হয়। বিবাহে "ধবল" গেয়। উৎসবে "মঙ্গল" নামক গীত অনুষ্ঠিত হয়। যোগিজনকর্তৃক চর্যা গীত হয়। চর্যাগীতে "মণ্ডীঢক্কা" বাদনের কথাও সোমেশ্বর বলেছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে চর্যাপ্রবন্ধের প্রচলন ছিল বলে মনে হয়— নতুবা সোমেশ্বর বারংবার চর্যার উল্লেখ এবং উদাহরণ প্রদান করতে চেষ্টা করতেন না।

অম্বষ্ঠ জাতি

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ঐতিহাসিক স্বর্গত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার *Political History of Ancient India* সংজ্ঞক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের অম্বষ্ঠ জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিগত বিশ বৎসর কালমধ্যে আমরা কতিপয় প্রবন্ধে এই আলোচনায় কিঞ্চিৎ নূতন তথ্য সংযোগের চেষ্টা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী এবং বাংলা প্রবন্ধ যথাক্রমে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের *Journal of the U. P. Historical Society*র পত্রিকায় এবং ১৩৫১ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭২ সাল, পৃষ্ঠা ৩৩৭-৪১) আমাদের মতামতের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের আলোচনায় অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিলেও দেখিতেছি, তিনি অম্বষ্ঠ জাতি সম্বন্ধে লিখিত আমাদের সমস্ত রচনা পাঠ করেন নাই এবং প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কেও তিনি সম্যক সজাগ নহেন। তাই ইতিহাসরসিক বাঙালী পাঠকের কাছে প্রসঙ্গটি পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

পাঠকসাধারণের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য প্রথমতঃ রায়চৌধুরী মহাশয় আলোচ্য প্রসঙ্গে কি বলিয়াছেন, তারপর উহাতে আমরা কি নূতন তথ্য যোগ করিয়াছি এবং সর্ব্বোপরি শ্রীযুক্ত মজুমদার *History of Bengal*, Vol. I গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন আর এখনই বা কি বলিতেছেন, এগুলি স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

রায়চৌধুরী মহাশয়ের মতামতের জন্য আমরা পাঠকদিগকে তদীয় গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ (১৯৩৮), পৃষ্ঠা ২০৬-০৭ এবং পঞ্চম সংস্করণ (১৯৫০), পৃষ্ঠা ২৫৫-৫৬ পড়িতে অনুরোধ করি। দুটি সংস্করণ মিলাইয়া পড়িলে যে সামান্য পার্থক্য দেখা যাইবে তাহা এই যে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকার বাঙালী বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন, কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈদ্যাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক এ কথা বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ আমাদের প্রবন্ধ পাঠের পর) তিনি ঐ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীযুক্ত মজুমদারের অবস্থাও অনুরূপ। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *History of Bengal* (পৃষ্ঠা ৫৯১) গ্রন্থে তিনি বৈদ্যজাতির অম্বষ্ঠত্ব অসম্ভব বলেন নাই; কিন্তু 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় আমাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, বাঙালী বৈদ্যেরা সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠ নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দী

হইতে বাঙালী বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলা হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, রায়চৌধুরী মহাশয় অম্বষ্ঠ জাতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চেনাব-সিন্ধুসঙ্গমের উত্তরস্থিত পশ্চিম-পঞ্জাবের মণ্ট্-গোমারী অঞ্চলবাসী মালবজাতির প্রতিবেশী অম্বষ্ঠেরা গ্রীকসম্রাট্ আলেকজান্দার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকেরা এই জাতিকে Abastanoi, Sambastanoi প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার সংস্কৃত রূপ অম্বষ্ঠ বা আম্বষ্ঠ। অম্বষ্ঠ দেশে গণশাসন প্রচলিত ছিল। উহার সেনাদলে ৬০০০০ পদাতি, ৬০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০ রথ ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২১) জনৈক অম্বষ্ঠ নরপতির উল্লেখ আছে। মহাভারতে (২।৫২।১৪-১৫) শিবি, ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি পঞ্জাববাসী জাতির সহিত অম্বষ্ঠদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণে তাহাদিগকে আনবক্ষত্রিয় (যযাতি পুত্র অনুর বংশধর ম্লেচ্ছবৎ ক্ষত্রিয়) এবং শিবিদিগের জ্ঞাতি বলা হইয়াছে। বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্রে কাশ্মীর, হূণ, অম্বষ্ঠ এবং সিন্ধু একযোগে উল্লিখিত দেখা যায়। 'অম্বট্‌ঠসুত্ত' সংজ্ঞক পালি গ্রন্থে জনৈক অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়, অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত বর্ণসঙ্কর জাতি এবং তাহারা চিকিৎসাজীবী। আবার একখানি জাতকে দেখিতে পাই, অম্বষ্ঠ জাতি কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। তাই রায়চৌধুরী মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে অম্বষ্ঠ জাতি যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল; কিন্তু পরে তাহারা পৌরোহিত্য, কৃষিকার্য্য, চিকিৎসা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে। উত্তরকালে অম্বষ্ঠদিগকে অমরকণ্টক পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল এবং পূর্ব্বভারতের বিহার ও বাংলা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রায়চৌধুরী মহাশয় বিহারের অম্বষ্ঠকায়স্থ এবং বাংলার বৈদ্যজাতির উল্লেখ করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, প্রাচীন পঞ্জাববাসী অম্বষ্ঠগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত সমীচীন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মান্দসোরের একখানি শিলালিপিতে দেখা যায়, একদল তন্তুবায় দক্ষিণ গুজরাত হইতে পশ্চিম মালবে উপনিবেশ স্থাপনের পর বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করে। কেহ বা তন্তুবায়ই রহিয়া গেল; আবার কেহ বা ধনুর্দ্ধর, কথক, ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যাতা, দৈবজ্ঞ, সৈনিক প্রভৃতি নানা বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মতে প্রাচীন অম্বষ্ঠ জাতির বিভিন্ন ব্যবসায়জীবী বংশধর আরও কয়েকটি জাতি পাওয়া যায়। ভাগবতপুরাণ (১০।৪৩।৪ হইতে) পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এক সময়ে স্থানবিশেষে উপনিবিষ্ট অম্বষ্ঠেরা হস্তিচালক অর্থাৎ মাহুতের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। আবার দক্ষিণ ভারতের তামিল ও মলয়ালমভাষী অঞ্চলের যে অম্বষ্ঠেরা আজ চিকিৎসা, ক্ষৌরকর্ম্ম, পৌরোহিত্য ও গীতবাদ্যজীবী এবং বৈদ্য নামে পরিচিত, তাহারাও প্রাচীন অম্বষ্ঠজাতির বংশধর। Ptolemy-র ভূগোলে (৭।১।৬৬) Ambastai বা অম্বষ্ঠদিগকে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী বলা হইয়াছে। কারণ তাহাদের

দেশ Bettigoi জাতির দেশের নিকটবর্ত্তী দেখা যায় এবং এই Bettigoi জাতির নাম অবশ্যই Mount Bettigo অর্থাৎ মলয় পর্ব্বতের নাম হইতে উদ্ভূত। Bettigoi এবং Ambastai Bettigo বা মলয় পর্ব্বত হইতে বহুদূরে বাস করিত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য 'সূতসংহিতা' সংজ্ঞক গ্রন্থে মাহিষ্যদিগকেও অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থখানি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায়, প্রাচীন অম্বষ্ঠ জাতির বংশধরদিগের মধ্যে বিহারের অম্বষ্ঠ-কায়স্থ এবং বাংলার অম্বষ্ঠ-বৈদ্যের সহিত দক্ষিণ ভারতের অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ক্ষৌরকারদিগকেও গণনা করিতে হইবে। সেইরূপ অম্বষ্ঠ জাতির অবলম্বিত বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে ক্ষৌরকর্ম্মেরও গণনা প্রয়োজন।

দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের মধ্যে অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ক্ষৌরকারদিগের সামাজিক মর্য্যাদা কম নহে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর চালুক্য ও পাণ্ড্য লেখমালায় বৈদ্যজাতীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। তামিলভাষী অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাসে অনুরাগী পাঠক অবগত আছেন যে, সেখানে ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজ ব্যতীত অন্যান্য জাতিগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—'বামহস্ত' (কারুজীবী) এবং 'দক্ষিণহস্ত' (কৃষিজীবী)। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদা লইয়া রেষারেষির উল্লেখ ১২শ-১৩শ শতাব্দীর চোল সম্রাটগণের লেখমালায় উল্লিখিত আছে। অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ক্ষৌরকারগণ 'বামহস্ত' সম্প্রদায়ের রথকারগণের অর্থাৎ স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, তট্ঠকার, স্থপতি এবং সূত্রধর জাতির সমবর্গীয়। প্রাচীন চোল আমলের লেখমালায় দেখা যায়, রথকারেরা আপনাদিগকে 'ব্রহ্মবৈশ্য' (অর্থাৎ অম্বষ্ঠের ন্যায় ব্রাহ্মণের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান) বলিয়া দাবি করিত। অবশ্য বর্ত্তমানকালে আন্ধ্র প্রদেশের রথকারেরা আপনাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার সন্তান 'বিশ্বব্রাহ্মণ' বলিয়া প্রচার করে এবং খাঁটি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর সামাজিক মর্য্যাদার অধিকার দাবি করে। এই রথকারেরা অনেকে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ পাঠ করে এবং আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রানুসারে স্বজাতীয় কিংবা ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদন করায়। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজদ্বারে সামাজিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তাহারা বেদাদি শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া 'রথকারাধিকারম্' সংজ্ঞক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিল। অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ক্ষৌরকার ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় সামাজিক সম্প্রদায়ের বিবরণ E. Thurston and K. Rangachari প্রণীত *Castes and Tribes of South India* সংজ্ঞক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। আমাদের প্রবন্ধে ঐ গ্রন্থ হইতেই দক্ষিণ ভারতীয় অম্বষ্ঠ জাতির বিবরণ প্রধানতঃ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবসায়ীরা মধ্যযুগে বৈদ্যসংজ্ঞক সুসংহত সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছিল। পাল-সেন আমলের পূর্ব্বে এদেশে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় বৈদ্যজাতীয় উচ্চরাজকর্ম্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাঁহারা যে আধুনিক অম্বষ্ঠবৈদ্য ক্ষৌরকারের পূর্ব্বপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের অন্যত্র চিকিৎসকেরা সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক

গোষ্ঠীতে পরিণত হয় নাই। আবার পাল-সেন আমলে যে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে দক্ষিণ-ভারতীয়েরা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। তাই আমরা বলিয়াছি যে, দক্ষিণ ভারতীয় অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ক্ষৌরকারগণ আদিমধ্যযুগে বাংলায় উপনিবিষ্ট হইবার ফলে উহাদের সহিত বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত স্থানীয় চিকিৎসকদিগের সংমিশ্রণ ঘটায় এদেশের বৈদ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে।

যেমন ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাগ্যান্বেষী মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া ভারতীয় সুলতানদিগের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত, সেইরূপ বাংলায় দক্ষিণ ভারতীয় সেন বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন শ্রেণীর দক্ষিণ ভারতবাসীর এদেশে উপনিবেশ স্থাপন সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আবার পাল রাজসভাতেও দক্ষিণীদিগের সমাদর ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল কর্ণাট দেশের রাষ্ট্রকুটরাজবংশের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের সময় হইতেই পাল সেনাদলে কর্ণাট সৈন্যের স্থান হয়। পরবর্ত্তী কালে চোলদেশীয় সেনাও পালসৈন্যদলে স্থান পাইয়াছিল। ধর্ম্মপালের বংশধরদিগের মধ্যে অনেকে কর্ণাটদেশীয় রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে দক্ষিণ ভারতের সহিত বাংলা দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে রামপালের রাজত্বকালে তাঁহার রাষ্ট্রকুটবংশীয় আত্মীয়গণ বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন, সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিতে' তাহার প্রমাণ আছে। ঐ আত্মীয়গণের সাহায্যেই রামপাল কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

আমাদের বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের অম্বষ্ঠজাতি এবং দক্ষিণ ভারতীয় অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ক্ষৌরকারগণের সহিত বাংলার অম্বষ্ঠ-বৈদ্যের সম্পর্ক বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, উপরে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইল। এখন দেখা যাউক, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এসম্বন্ধে কি বলিতে চান। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৭১ সাল) আমাদের 'আদিশূরের কাহিনী' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মজুমদার মহাশয় উহারই অংশবিশেষের সমালোচনা করিয়াছেন।

আদিশূরের কাহিনী সম্পর্কিত প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, কাহিনীটি মূলতঃ দক্ষিণ ভারত হইতে সেন আমলে বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয়দিগের বাংলায় বসতি স্থাপনের কথা উঠিয়াছে এবং সেই আলোচনার অঙ্গ হিসাবে ঐ দেশের চিকিৎসা ও ক্ষৌরকর্ম্মজীবী অম্বষ্ঠবৈদ্যগণের এদেশে আগমনের সহিত এখানকার চিকিৎসাব্যবসায়ী অম্বষ্ঠবৈদ্য সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সম্ভাবনা উল্লিখিত হইয়াছে। মজুমদার মহাশয় প্রবন্ধটিতে দক্ষিণের অম্বষ্ঠবৈদ্য ক্ষৌরকারগণের সহিত বাঙালী অম্বষ্ঠবৈদ্যের সম্বন্ধ বিষয়ক উক্তি অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক।

বিগত বিশ বৎসর মধ্যে আমরা আলোচ্য বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহার কয়েকটি মাত্র বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত মজুমদার অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমাদের প্রথম ইংরাজী প্রবন্ধটি পড়িবার জন্য *Journal of the U. P. Historical Society* পত্রিকার সংখ্যাবিশেষ সংগ্রহে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। ইহা বোধহয় আমাদের অপরাধ নহে। তা ছাড়া পত্রিকাটি অত দুষ্প্রাপ্য হইলে রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে উহার উল্লেখ করিতে পারিতেন না। তিনি আমার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধেরও উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু মজুমদার মহাশয় উহার সন্ধান রাখেন না। রাখিলে হয়ত *Journal of the U. P. Historical Society*র দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাকে অত কথা বলিতে হইত না।

মজুমদার মহাশয় বলিতেছেন যে, আমাদের প্রথম ইংরাজী প্রবন্ধে এমন কোনও ইঙ্গিত নাই যে, দক্ষিণভারতের অম্বষ্ঠবৈদ্য ক্ষৌরকারগণের সহিত বাংলার অম্বষ্ঠ-বৈদ্যসমাজ গড়িয়া উঠিবার সম্পর্ক রহিয়াছে। তাঁহার মতে এই নূতন কথাটি আমরা আমাদের *Journal of the Asiatic Society* (*Letters*), Vol. XIV, 1948 (পৃষ্ঠা ১০৬) তে তিন বৎসর পরে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলিয়াছি এবং উহা পূর্ব্বের প্রবন্ধটির সিদ্ধান্তের বিরোধী। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই উক্তি ভ্রান্তিমূলক। কারণ আমার ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধে আমি প্রথমে বলিয়াছি, It is unknown whether the Senas of *Bengal were absorbed in the Kayastha or the Vaidya community* and whether they belonged to the Ambashtha community of South India. The caste organisation of the Bengal Vaidyas, however, may have been influenced in some way by the Southerners who entered Bengal during the Sena epoch and must have exercised great influence at the Bengal court. But we do not know if some Ambashtha-Vaidyas of the Deccan also entered the country in the same epoch and merged themselves in the Bengali Vaidya community. ইহারই পাদটীকায় প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় বৈদ্যের উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া আবার বলিয়াছি, It is probable that these Vaidyas belonged to the present day community of the Ambashtha-Vaidyas of the Tamil land. Their entry into Bengal in the train of the Canarese conquerors is also quite probable. ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিবেন, যে, রমেশবাবুর অভিযোগ সত্য নহে।

তবে আমাদের পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে উল্লিখিত সম্ভাবনার উপর কিঞ্চিৎ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণ এই। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কবিকণ্ঠহার রচিত 'সদ্বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা'য় বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ বলা হয় নাই ; কিন্তু ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ভরতমল্লিকের

'চন্দ্রপ্রভা'য় বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথম আমাদের সন্দেহ হয় যে, বাঙালীবৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব কল্পনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু পরে আমরা দেখিলাম যে, 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা' অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে জনৈক বাঙালী বৈদ্যকে 'গৌড়-অম্বষ্ঠ' বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চন্দ্রশেখরকৃত 'সুর্জনচরিত'। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের পরিচয়সূত্রে বলা হইয়াছে :

গৌড়ীয় কিল চন্দ্রশেখরকবিঃ প্রেমপাত্রং সতাম্
অম্বষ্ঠান্বয়মণ্ডনাৎ কৃতধিয়ো জাতো জিতামিত্রতঃ।
নির্বন্ধান্নৃপসুর্জনস্য নিতরাং ধর্মৈকতানাত্মনো
গ্রন্থোঽয়ং নিরমায়ি তেন বসতা বিশ্বেশিতুঃ পত্তনে॥

—*Indian Historical Quarterly*, vol. XIV,
September 1938, p. 579

এই গৌড়বাসী অম্বষ্ঠজাতীয় কবি চন্দ্রশেখর কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত 'চৈতন্যচরিতামৃতে' চন্দ্রশেখর বৈদ্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন (চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ)। স্বর্গত হেমচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার Dynastic History of Northern India (Vol. II. p. 1061, note 4) তে গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছেন। পরে উহা তৎকর্তৃক *Indian Historical Quarterly* পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যদি ষোড়শ শতাব্দীতে বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়, তবে সপ্তদশ শতাব্দীর একখানি গ্রন্থে উহার অনুল্লেখকে মূল্যবান মনে করা যায় না।

শ্রীযুক্ত মজুমদার বলেন, "দীনেশবাবু অনুমান করিয়াছেন যে, কর্ণাটবংশীয় সেন-রাজাদের আমলে বৈদ্যেরা সম্ভবতঃ বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং বাংলার এক বা একাধিক সামাজিকগোষ্ঠীর সহিত তাঁহাদের সংমিশ্রণের ফলেই বৈদ্য নামক একটি বিশিষ্ট জাতি বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অনুমান প্রমাণসহ না হইলেও সংগত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনো বাধা নাই।" ভাল কথা। কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের মতে, দক্ষিণ-ভারতীয় লেখমালায় যে বৈদ্যজাতীয় রাজকর্মচারীদিগের উল্লেখ আছে, তাঁহারা বর্তমান অম্বষ্ঠবৈদ্যক্ষৌরকারদিগের পূর্বপুরুষ হইতে পারেন না এবং যে সকল বৈদ্য প্রাচীন কালে কর্ণাট ও পাণ্ড্যদেশে বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন ও বিশিষ্ট রাজকার্যে নিযুক্ত হইতেন, কর্ণাট হইতে আসিবার কালে সেনরাজগণ সেই সকল উচ্চশ্রেণীর বৈদ্যকেই সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তুচ্ছ ক্ষৌরকারদিগকে নহে। আমাদের বিবেচনায়, এই উক্তিতে মজুমদার মহাশয় যে কয়েকটি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার সবগুলিই ভ্রান্ত।

প্রথমতঃ, দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে যে বৈদ্য জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, উহাই যে বর্তমান অম্বষ্ঠবৈদ্য ক্ষৌরকার জাতি— বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে এই সিদ্ধান্ত আমরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। অবশ্য প্রাচীন লিপিতে বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ বলা হয় নাই। কিন্তু অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙালী

বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা'য় উহার উল্লেখ নাই। এইরূপ অনুল্লেখের উপর নির্ভর করার ভ্রান্তিকেই ন্যায়শাস্ত্রে argumentum ex silentio বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সেনরাজগণের সেনাদলে এবং তাঁহাদের আশ্রিতগণের মধ্যে অনেক অম্বষ্ঠ-বৈদ্য থাকিতে পারে। আবার বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বদেশীয় নরপতির প্রসাদলোভী দক্ষিণভারতীয়গণ অনেকে আপনা হইতেই সেনরাজসভাতে ভীড় করিত, তাহাও সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পালরাজাদের প্রসাদভোজীদের মধ্যেও কর্ণাট ও চোলদেশবাসীদিগকে উল্লিখিত দেখা যায়। তবু ত পালেরা দক্ষিণভারতীয় ছিলেন না, কেবল দক্ষিণের রাজবংশ বিশেষের সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন মাত্র।

মজুমদার মহাশয় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, বাঙালী অম্বষ্ঠবৈদ্যগণ উচ্চ সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে কেবল উচ্চশ্রেণীর দক্ষিণ ভারতীয়ের অর্থাৎ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির সহিত সংমিশ্রিত হওয়া সম্ভবপর, ক্ষৌরকারদিগের সহিত নহে। প্রশ্ন এই— দক্ষিণ ভারতীয় অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ক্ষৌরকারেরা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিত কি না এবং বাংলার বৈদ্যগণ তাহাদের চেয়ে সামাজিক মর্য্যাদায় উচ্চতর কি না।

প্রাচীন ভারতে (বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে— যেখানে প্রকৃত ক্ষত্রিয়-বৈশ্যর সংখ্যা নগণ্য) উচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীরা যে সকলেই সামাজিক মর্য্যাদায় উচ্চ ছিলেন না, তাহার অগণিত প্রমাণ আছে। বাঙালী পাঠকেরা অবগত আছেন যে, কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্বোক পালরাজগণের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বাহুবলে বরেন্দ্রীতে কৈবর্ত্ত-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক কালে মৎস্যজীবী কৈবর্ত্তেরা *জাল ছড়িয়া হাল ধরিলেই* উচ্চতর *সামাজিক মর্য্যাদার দাবি করে* একং উপবীত *গ্রহণ* করিলে হয়ত ব্রাহ্মণত্বই দাবি করিত। কিন্তু তাহাদিগকে কিছুতেই দক্ষিণ ভারতের অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ক্ষৌরকার অপেক্ষা উচ্চতর সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী বলা চলে না। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় অনেক শূদ্রজাতীয় রাজা ও রাজকর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ সাধারণতঃ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু উভয়ত্রই তাহারা উচ্চ সামাজিক মর্য্যাদা দাবি করে। বাংলা দেশের বৈদ্যগণকে পূর্ব্বে শূদ্র বলা হইত এবং শূদ্ররূপে গণিত কায়স্থদিগের সহিত তাহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ ঘটিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতমল্লিকের বৈদ্যকুলপঞ্জী 'চন্দ্রপ্রভা'তে তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। "অতিদিষ্টং হি বৈদ্যস্য শূদ্রত্বম্" ইত্যাদি এবং "ডোমনঃ পালজামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। কিন্তু 'চন্দ্রপ্রভা' রচয়িতা বৈদ্যগণের বৈশ্যত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজবল্লভের নেতৃত্বে বৈদ্যেরা বৈশ্যত্ব দাবি করিয়া 'গুপ্ত' নামান্ত গ্রহণ করে এবং উপবীত ধারণ করিতে থাকে। আধুনিক কালে তাহারা ব্রাহ্মণত্ব দাবি করিয়া 'শর্ম্মা' নামান্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। এদেশে এখন সকলেই এইরূপ উচ্চ সামাজিক মর্য্যাদা দাবি করিতেছে— কায়স্থেরা

ক্ষত্রিয়, সাহারা বৈশ্য, গোয়ালারা যাদব ক্ষত্রিয়, পোদেরা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, আগুরিরা উগ্র-ক্ষত্রিয়, বাগদীরা ব্যাগ্র ক্ষত্রিয়, চণ্ডালেরা নমঃশূদ্র বা নমোব্রাহ্মণ, নাপিতেরা নাই বা সাবিত্রী ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, দক্ষিণভারতের কারুজীবীরা আদিমধ্যযুগে ব্রাহ্মণের বংশধরত্ব দাবি করিত এবং বর্ত্তমানে তাহারা অনেকে আপনাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উচ্চতর মনে করে।

দক্ষিণভারতের অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা প্রধানতঃ চিকিৎসা ও ক্ষৌরকর্ম্ম-জীবী; তাহারা পৌরোহিত্য প্রভৃতিও করিয়া থাকে এবং তাহাদের বুদ্ধিমত্তার খ্যাতি আছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে তাহারা তামিল অঞ্চলে ১১ দিন এবং মলয়ালম অঞ্চলে ১৬ দিন অশৌচ পালন করিত বলিয়া জানা যায়। বাংলা দেশের বৈদ্য বা কায়স্থেরা এই অম্বষ্ঠবৈদ্য ক্ষৌরকারদিগের অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদায় উচ্চ, এ কথা কেবল গায়ের জোরেই বলা যাইতে পারে, উহা প্রমাণ করা নিতান্ত অসম্ভব। যাহা হউক, যদি কোন বাঙালী ঐতিহাসিক সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে প্রয়াসী হন, তবে তিনি যেন প্রথমে দাক্ষিণাত্যের সামাজিক ইতিহাসের কিছু চর্চ্চা করেন। কারণ জ্ঞানাভাব ঐতিহাসিক সত্যনিরূপণের সহায়ক হয় না।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আরও একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। উহা এই যে, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত আমাদের প্রবন্ধবিশেষের রমেশবাবু কৃত সমালোচনা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সমালোচনার উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ উহা প্রকাশ করেন নাই। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আলোচনাটি এখানে পত্রস্থ করা গেল। এই লেখাটি দীনেশবাবু দেখেছেন; উত্তরে তিনি আরও কিছু অতিরিক্ত যুক্তি দেখিয়ে ও তথ্য সংযোগ করে নিজ অভিমত সমর্থন করেছেন। কোনো বিতর্কেরই শেষ নেই। সেই জন্য তাঁর রচনাটি আর প্রকাশ করা গেল না। এ বিষয়ে আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করলাম।" সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি চাপা দিবার পক্ষে সম্পাদক মহাশয়ের ফন্দীটি প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র; কারণ তিনি আমাদের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, ঐটুকু না লিখিয়া তদপেক্ষা অধিক অবিচার করিতে পারিতেন।